চট্টগ্রামের শিকার কাহিনী

এরশাদ উল্লা খান

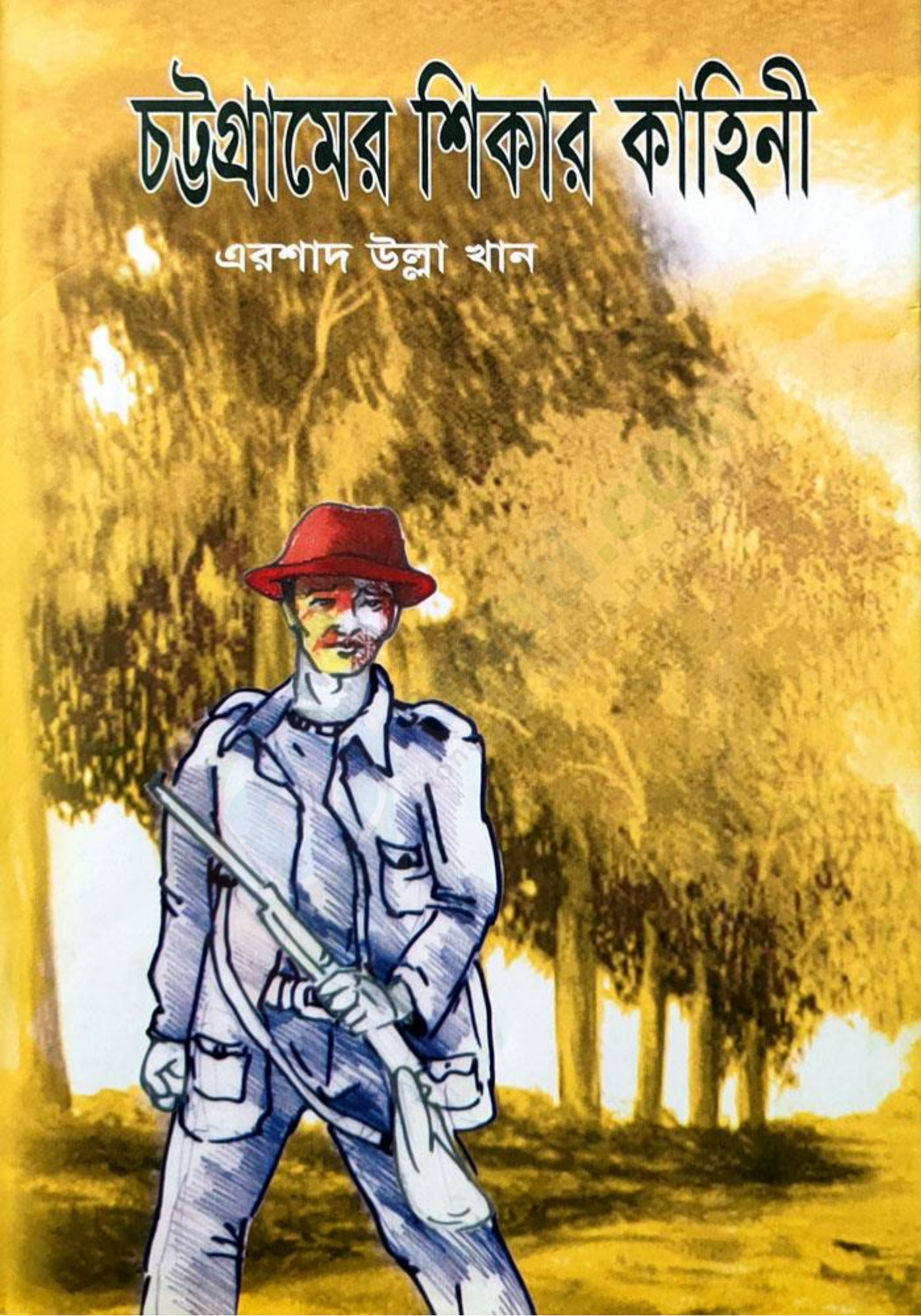

বনাঞ্চল, বনের বাসিন্দা, বনের পশু-পাখি এগুলোর সাথে সময় কাটানো অনেকের প্রিয় নেশা। শিকার করা, বনে ঘুরে বেড়ানো, বনের পরিবেশ রক্ষা করা এসব নিয়েই বন-প্রেমিক এসব মানুষের জীবন কাটে। শিকার কাহিনী শোনা সংগ্রহ করা এগুলোও প্রিয় হবিগুলোর একটি।

চট্টগ্রাম অঞ্চলের নামকরা ক'জন শিকারির ভয়ঙ্কর শিকার কাহিনী নিয়ে এ গ্রন্থ। লেখক বনাঞ্চল ও বনের পশু-পাখির বর্তমান দৈন্যাবস্থায় দারুণ ব্যথিত। বনের পরিবেশ রক্ষার আকুতি তাই গ্রন্থে ফুটে উঠেছে আন্তরিক ছোঁয়া নিয়ে।

জীবনের সকল পরতেই লেখক শিকারকে দেখেছেন বিনোদন হিসেবে, নেশাগ্রস্থের মতো শিকারীদের কাছে ছুটে গেছেন। পরম আগ্রহ নিয়ে শুনেছেন সব সফল শিকারের কাহিনী, আর তাঁর অভিজ্ঞতার ভান্ডার হয়ে উঠেছে সমৃদ্ধতর।

শিকার কাহিনীর এই বিশাল সঞ্চয় থেকে এরশাদ উল্লা খান বাছাই করেছেন গ্রন্থিত এ ক'টি। তবে বর্তমান জংগল এবং পশু-পাখির দৈনদশা স্বভাবতই লেখককে দারুণভাবে ব্যথিত করে। জংগল ও পশু-পাখি এতদ অঞ্চলের জংগলের পরিবেশের যথা সম্ভব বর্ণনা দেয়া হয়েছে বইটিতে।

চট্টগ্রামের শিকার কাহিনী

(জঙ্গলের পরিবেশ সম্বলিত শিকার কাহিনী)

এরশাদ উল্লা খান

Chunati.com
Pioneer in village based website

জীবন প্রকাশন

সূচি

১।	সোনাদিয়ায় হাতির হত্যাকাণ্ড	১৩
২।	চেঙ্গির ধূর্ত বাঘ	২৬
৩।	আহত এক রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মুখোমুখি	৩৯
৪।	আমার শিকারের জীবন	৪৪
৫।	চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় বাঘ শিকারের বিচ্ছিন্ন কয়েকটি ঘটনা	৫০
৬।	চুনতি অভয়ারণ্যের ইতিকথা এবং চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চলের অবস্থা	৬৩

Chunati.com Pioneer in village based website

©
হামিদা বেগম

প্রকাশক
জীবন প্রকাশন
৩৮/২খ তাজমহল মার্কেট (৩য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১৭৫১৩৯

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারি, ২০০৫

প্রচ্ছদ
ডিজাইন মিডিয়া

কম্পোজ
জীবন কম্পিউটারস্
৩৮/২খ তাজমহল মার্কেট (৩য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
আল্-কাদের অফসেট প্রিন্টার্স
ঢাকা-১১০০

মূল্য
৬০.০০ টাকা মাত্র।

ISBN-984-31-0995-3

উৎসর্গ

আমার সুন্দর এই
সুখী পরিবারের
সকল সদস্য
এবং
আমার
মরহুম আব্বা-আম্মাকে

Chunati.com
Pioneer in village based website

ভূমিকা

কয়েক দশক পূর্বেও গহিন বনজঙ্গল এবং গাছপালায় আবৃত চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনভূমি ছিল নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ। বন্য জীবজন্তু, পশুপক্ষী এবং হিংস্র জানোয়ারের অবাধ বিচরণস্থল হিসেবে চিরহরিৎ এ বনভূমির নামডাক ছিল সারা দেশ জুড়ে। এখানকার জঙ্গলের বিস্তৃতি, অবর্ণনীয় প্রাকৃতিক পরিবেশ ও শোভা এক সময়ে শুধু ভ্রমণ পিপাসুদের মোহিত করত না বরং শিকার যখন বৈধ ছিল তখন শিকারাভিলাষীদের জন্য এ জঙ্গল ছিল এক স্বর্গরাজ্য।

কালের ব্যাপ্ত পরিসরে এ বনাঞ্চল হতে নানাবিধ বন্য প্রাণী ও পশুপক্ষী শুধু বিলুপ্ত হয়নি, বরং এগুলোর আবাসস্থল দখল করে নিয়েছে জন-মানব-বসতি। বনাঞ্চলের পরিধি দ্রুত আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পাওয়ার ফলে এখানে পরিবেশের শোচনীয় বিপর্যয়ের সাথে সাথে বন্যপ্রাণীর প্রাপ্যতাও আশাতীতভাবে হ্রাস পায়। বর্তমানে বনজঙ্গল সঙ্কুচিত হওয়াতে বন্যপ্রাণীর দুরবস্থা দেখলে যে কোন হৃদয়বান ব্যক্তির প্রাণে করুণার উদ্রেক হয়। অনেক স্থানে দিনের বেলাতেও হাতির পাল দেখা যায়, কারণ এগুলোর আবাসস্থল বলতে অল্প জায়গাই অবশিষ্ট আছে। জলাশয়ে পানি শুকালে অসহায় মাছ যেভাবে ছটফট করে তদ্রূপ বর্তমানে করুণ অবস্থা এখানকার বন্য প্রাণীর।

একথা অনস্বীকার্য যে, বনাঞ্চল ধ্বংসের সাথে সাথে শিকারের দুষ্প্রাপ্যতা ও পরিবেশ ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়া ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শিকার নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে বনাঞ্চলের পরিবেশ যখন অক্ষুণ্ন ছিল, তখন সৌখিন শিকারিদের বিনোদনমূলক এবং পেশাদার শিকারিদের যত্রতত্র শিকার সত্ত্বেও এ বনাঞ্চলে বন্যপ্রাণীর দুষ্প্রাপ্যতা দেখা দেয়নি। শিকার কাহিনীর পাশাপাশি এসব বনাঞ্চলে কিছুকাল পূর্বেও বন্যপ্রাণীর প্রাচুর্যের বর্ণনাসহ জঙ্গলের প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর আলোকপাত করা এ বইয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। বর্তমান বনাঞ্চলের দৈন্যদশা এবং বন্য পশুপক্ষীর বিলুপ্তির বিষয়ে ধারণা এবং এর সংশোধনমূলক কিছু প্রস্তাব রাখারও উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এ বইতে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সম্প্রতি বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের (বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি) জন্য বনজঙ্গল উজাড়, ভূগর্ভস্থ পানির অবিবেচক ব্যবহার, কলকারখানা ও যানবাহন হতে বিষাক্ত ধোঁয়ার উদগীরণ ইত্যাদি কারণসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে, যেগুলো প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্টের জন্য

প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। এধরনের ক্ষতিকারক কার্যকলাপ দ্বারা যদি "ওজোনস্তর" (যা পৃথিবীকে মহাজাগতিক তেজস্ক্রিয়া হতে রক্ষা করে) এর ক্ষতি সাধিত হয় এবং পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে, তা'হলে অচিরেই মেরুদেশসমূহে অধিক পরিমাণে বরফ গলতে শুরু করবে। পরিণামে বাংলাদেশের মত ব-দ্বীপসমূহের বেশ কিছু অংশ অদূর ভবিষ্যতে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে ইঙ্গিত দিচ্ছেন বৈজ্ঞানিকগণ। এদিকে আমাদের দেশে বনজঙ্গলের করুণ অবস্থা এমন এক সময়ে পরিলক্ষিত হচ্ছে যখন বিশ্বব্যাপী এ সমস্যা আলোড়ন সৃষ্টি করে চলছে।

আমার স্ত্রী হামিদা বেগমের সার্বক্ষণিক উৎসাহ বইটি রচনার ব্যাপারে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। এ ব্যাপারে আমার ছেলে রাসেল এবং কন্যা নুসরাত ও ইসরাতের আগ্রহও আমাকে উৎসাহী করে তুলেছে।

বইটি প্রকাশের ব্যাপারে শুভার্থী ছোট ভাই মাহফুজুর রহমান ও তাঁর স্ত্রী নাদিরা বেগম অশেষ সহযোগিতা করেছেন–তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস সার্থক হবে যদি বইখানা পাঠকদের আনন্দ দিতে সক্ষম হয়। বইটির যে কোন প্রকার সমালোচনা সাদরে গৃহীত হবে।

এরশাদ উল্লা খান

সোনাদিয়ায় হাতির হত্যাকাণ্ড

(শিকারি কর্তৃক বর্ণিত)

আরকান রোডের পশ্চিম প্রান্তে সাতকানিয়া, লোহাগাড়া এবং বাঁশখালি থানা-সমূহের মধ্যবর্তী স্থানে বিশাল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত পর্বতমালার উত্তর সীমান্তের পর্বতগুলোর নাম সোনাদিয়া পাহাড়। এটার উত্তর-পূর্ব পাদদেশে অবস্থিত ছোট একটা পাহাড়ি গ্রামের নাম ষাইটতলি। গ্রাম হতে চার পাঁচ মাইল দূরত্বে অবস্থিত গঞ্জের সেনের হাট। প্রতি সপ্তাহে দু'দিন এ হাট বসে। গ্রামের অনেক দরিদ্র মজুর প্রত্যেক হাটের দিন জঙ্গল থেকে বাঁশ, কাঠ, ঘরের ছাউনি ইত্যাদি এনে এগুলো বিক্রি করতে নিয়ে যায় গঞ্জের হাটে। ষাটের দশকের শেষের দিকে এ গ্রামে ঘটে যায় হঠাৎ এক লোমহর্ষক ঘটনা।

হাটের দিন শনিবার সোনাদিয়ার জঙ্গল হতে ঘরের ছাউনি আনার জন্য সকালে জঙ্গলের দিকে রওয়ানা দেয় দিনমজুর আজিমুদ্দিন। সময়মত হাটে পৌঁছলে দুপুরের পূর্বেই তার বাড়ি ফেরার কথা। সন্ধ্যা নাগাদ যখন সে বাড়িতে ফিরল না তখন তার স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েরা আন্দাজ করে নিল যে, বাড়ি না এসে তাদের বাড়ির কর্তা হয়তো সোজা গঞ্জের হাটে চলে গেছে। অনেক রাত অবধি যখন সে আসল না তখন হাট ফেরত লোকজন থেকে খবর নিয়ে জানা গেল, গঞ্জের হাটেও তাকে কেউ দেখতে পায়নি এবং সম্ভাব্য নানান স্থানেও তার কোন খোঁজ মেলেনি। তখন তার জন্য দুশ্চিন্তায় পড়ে যায় আত্মীয়-স্বজন এবং পাড়া-পড়শি।

জঙ্গল হতে আজিমুদ্দিন ফিরেনি এ ব্যাপারে যখন সকলেই নিশ্চিত হয়ে যায়, তখন ঐ রাতেই সোনাদিয়ার পাহাড়ের দিকে একটি সন্ধানকারী দল তার তালাশে যাত্রা করতে উদ্যত হয়।। তবে রাত গভীর হওয়ার কারণে খোঁজা-খুঁজির অভিযান পরের দিনের জন্য স্থগিত রাখা হয়। পরের দিন প্রত্যুষে আজিমুদ্দিনের এক ছেলেসহ ছয় সাত জনের অনুসন্ধানকারী দল জঙ্গলাভিমুখে যাত্রা করে। পাহাড়ি এলোপাথাড়ি পথ ধরে দেড় থেকে দু মাইল অতিক্রম করার পর গহীন জঙ্গলে প্রবেশের পূর্বে তারা ছাউনি ঘাস বনের (স্থানীয় ভাষায় এগুলোকে "ছয়ন খোলা" বলা হয়) মধ্যবর্তী পথ ধরে এগুতে থাকে।

লতাগুল্ম এবং ছাউন্ন বনে আচ্ছাদিত দৃষ্টি সংকুচিত করা আঁকাবাঁকা পথ ধরে কিছুদূর এগুতেই হাতির পায়ের ছাপ দেখে তারা বিস্মিত হয়ে যায়, কারণ হাতির চলাচল এদিকটায় বড় একটা দেখা যায় না। ছাউন বনের পথ ধরে আরও কিছুদূর

এগুতেই হাতির তাজা পায়ের ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সামনে একটি নিচু খাদের মতো জায়গা পেরিয়ে উপরে উঠেছে পথটি। ও পথ ধরে উপরে উঠতেই হতবাক হয়ে যায় অনুসন্ধানকারী দল। ছাউন বনের বেশ কিছু জায়গা হাতির দ্বারা দুমড়ানো মোচড়ানো এবং তারি পাশে পড়ে আছে ছাউনের বোঝা বাঁধা দু'টি আঁটি।

আঁটি দু'টি যে আজিমুদ্দিনের তা কারো বুঝতে দেরি হয় না। এগুলোর বাঁ'দিকে একটি ঝোপের পাশে তাকাতেই আজিমুদ্দিনের কুণ্ডলী পাকানো লাশ কারো দৃষ্টি এড়ালো না। এহেন মর্মান্তিক অবস্থা আরো হৃদয়বিদারক হয়ে ওঠে তার ছেলের করুণ আর্তনাদে। বোঝাই যাচ্ছিল আজিমুদ্দিন যখন ছাউনির আঁটি বেঁধে কাঁধে নেয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল তখন এক পাশ থেকে তাকে আক্রমণ করে হাতিটি। শুঁড় দিয়ে ধরে পায়ের তলায় ফেলে পিষ্ট করে একদিকে ছুড়ে ফেলে দেয় তাকে ঘাতক জানোয়ারটি। এ ছিল হাতিটির প্রথম মানুষ হত্যা। এর পরই শুরু হয় হাতিটির একের পর এক হত্যা ও তাণ্ডবলীলা এবং ওটার নির্মম হত্যার শিকার হতে থাকে এলাকার নিরীহ জনগণ।

কয়েকদিন পর ঘটনাস্থল হতে তিন চার মাইল দক্ষিণে পাহাড়ি পথচারী একটি দলের উপর হামলা করে হাতিটি। এক মহিলাসহ দু'জনকে দিনেদুপুরে হত্যা করে। কিছুদিন যেতে না যেতেই নিকটবর্তী একটি বনাঞ্চলে শূকর থেকে ধান ক্ষেত রক্ষা করার জন্য প্রস্তুতকৃত মাচা হতে টেনে নিয়ে নির্মমভাবে পদদলিত করে একজন কৃষককে। বেচারি কৃষক রাতের অন্ধকারে হাতিটাকে ধানের ক্ষেতে বন্য শূকর নেমেছে মনে করে সজোরে চিৎকার করছিল। উদ্দেশ্য ছিল ভয় দেখিয়ে শূকর তাড়াবার । এতে পাগলা হাতিটি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং কিশোরটিকে পরিণামে হাতিটির পদতলে প্রাণ দিতে হয়। ঘটনাটি অন্য একটি মাচা হতে আর একজন কৃষক নিরুপায়ভাবে অবলোকন করছিল।

এ ধরনের খবর সাধারণত খুব দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তবে জনগণের সাবধানতা ও সতর্কতা প্রথমদিকে অতিমাত্রায় থাকলেও স্বাভাবিক কারণেই তা বেশিদিন স্থায়ী হয় না। তদুপরি একটি হত্যাকাণ্ডের পর এ সব জানোয়ার কয়েকদিনের জন্য গভীর জঙ্গলে গা ঢাকা দেয়, তখন জনগণ মনে করে হয়তো আপদ দূর হয়েছে। পরিণামে তাদেরকে অসতর্কতার খেসারত দিতে হয় জীবনের বিনিময়ে। এ ধরনের একটি অবস্থার মধ্য দিয়ে উক্ত এলাকায় এবং তার আশেপাশে হাতিটির মানুষ নিধন কর্মকাণ্ড অব্যাহত থাকে। দেখতে দেখতে কিছুদিনের মধ্যে হাতিটির দ্বারা ১১/১২ জন লোকের জীবনাবসান হয়।

ঘটনাটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় কালের কিছুদিন পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। বলাবাহুল্য হাতি মানুষঘাতক হলেও ওটা মারার পূর্বে বন বিভাগের পূর্বানুমতির প্রয়োজন। দেশে মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে কিছুটা বিশৃঙ্খল অবস্থায় অনুমতি নেয়া জটিল ব্যাপার মনে করে, কিংবা নরঘাতক এ জন্তুটিকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মারতে পারলে মহৎ কাজ হবে মনে করে, এলাকাবাসী এতকিছুর তোয়াক্কা না করেই বন্দুকধারী শিকারিদেরকে অনুরোধ জানাতে থাকে। এদের মধ্যে কয়েক জন শিকারি তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত সাহস দেখাতে গিয়ে হাতিটির কবলে পড়ে যায়, তবে ভাগ্যক্রমে নির্ঘাত মিত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে ফিরে আসে। এসব ক্ষেত্রে শিকারিকে হতে হয় সাহসী এবং ঠাণ্ডা মস্তিষ্কের অধিকারী। নির্বুদ্ধিতা ও কোন প্রকার উত্তেজনা অনেক সময় শিকারির জীবনের ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পরে অনেক শিকারি এবং জনগণ সম্মিলিতভাবে হাতিটিকে মারার জন্য অত্র এলাকার মির্জাখিল দরবার শরীফে বসবাসরত শিকারের জনৈক কিংবদন্তি জনাব রশিদ মিঞা চৌধুরীকে অনুরোধ জানায়।

জঙ্গলে শিকারে পারদর্শী ও অভিজ্ঞ একজন চৌকস শিকারি রশিদ মিঞার জীবন যেন শিকারের জন্যই উৎসর্গীকৃত ছিল। তিনি চট্টগ্রামস্থ চন্দনাইশ থানার অন্তর্গত সাতবারিয়া গ্রামের মৌলভী আহমদ হোসেন সাহেবের ছেলে। ১৯৫০ সালে প্রথম বিভাগে আই.এস-সি পাস করার পর পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে কমিশন পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১০ বছর দেশের বাড়িতে ছেলে আসতে পারবে না এরূপ অঙ্গীকারনামায় দস্তখত করতে তার বাবা অস্বীকৃতি জানায়, যার কারণে পাক বিমান বাহিনীতে তার যোগদান করা হয়নি। এরূপ শর্ত আরোপ করা হতো হয়তো পূর্ব-পাকিস্তানিদের এসব পেশায় নিরুৎসাহিত করার জন্য। পরবর্তীকালে মাস্টারি পেশায় যোগদান করে তিনি সারা জীবন আত্মনিয়োগ করেছিলেন মাস্টার হিসেবে।

শিক্ষকতা পেশার পাশাপাশি তার শিকার জীবন শুরু হয় পঞ্চাশের দশক হতে। ধর্মভীরু ও পীরমুর্শিদ ভক্ত রশিদ মিঞা ছিলেন একজন উচ্চমানের শিকারি। গভীর জঙ্গলে তার শিকার কাহিনীসমূহ যেমন বিস্ময়কর তেমনি লোমহর্ষক। তার শিকারের ধরন ছিল ভিন্নতর, রাত্রে ১২টার পর বন্দুক হাতে শক্তিশালী টর্চ লাইট নিয়ে একাকী বা কখনও দু' একজন সঙ্গীসহ গভীর জঙ্গলের অভ্যন্তরে হেঁটে হেঁটে শিকার করতেন। পাঁচ ব্যাটারির শক্তিশালী টর্চের প্রখর আলো অন্ধকার রাত্রে যে কোন বন্যপ্রাণীর সোজাসুজি চোখে পড়লে ওগুলোর চোখ ঝলসিয়ে ওঠে। তখন অবাক বিস্ময়ে আলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে বাধ্য হয় যে কোন প্রাণী। এসময়টাকে মোক্ষম সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করতেন তিনি। তবে তিনি নির্বিচারে প্রাণী হত্যার মোটেই পক্ষপাতী ছিলেন না। হাজার হাজার

বন্য প্রাণী যেগুলো হত্যা করা মোটেই সমীচীন মনে করতেন না, সেগুলো নিরাপদে তার সামনে থেকে চলে যেত। তার মতে ওগুলো জঙ্গলের সৌন্দর্য ও সম্পদ, বিনা কারণে ওগুলো হত্যা করা পাপ সমতুল্য। দেশে যখন শিকার বৈধ ছিল, সেকালে তিনি চট্টগ্রামের সাতকানিয়া, বাজলিয়া, দোহাজারি, পটিয়া, সাতবাড়িয়া প্রভৃতি এলাকার বিস্তীর্ণ জঙ্গলে ছোট/বড় হরিণ, সাম্বার, বাঘ, ভালুক, হাতি ইত্যাদি অনেক শিকার করেছেন। উল্লিখিত ঘাতক হাতিটি নিধন করার পূর্বে রশিদ মিঞার বহু বিচিত্র শিকার কাহিনীগুলোর মধ্যে নিম্নে কয়েকটির বর্ণনা দেয়া হলো ঃ

তার সর্ব প্রথম হাতে খড়ি হয় বাজালিয়ার জঙ্গলে। রাত্রে বেগুন ক্ষেতে একটি সাম্বার হরিণকে গুলি করলে সকালে ঐ স্থানে একাকী কিছু দুষ্কৃতিকারী দ্বারা আক্রান্ত হন। পরে অবশ্য ভাগ্যক্রমে বিপদমুক্ত হয়ে যান। এরপর হতে কয়েক যুগ ধরে সতর্কতার সাথে নিজ বন্দুক নিয়ে শিকার করেছিলেন। শিকার জীবনের প্রথম দিনে একদিন তার শিকারসঙ্গী আহমদ কবির ও ফজলকে নিয়ে খুব ভোরে মোরগ শিকারের উদ্দেশ্যে গজারিয়া এলাকার জঙ্গলে প্রবেশ করেন। যথাস্থানে পৌঁছে একটি মোরগ শিকারের পর জঙ্গলের অভ্যন্তরে এক জায়গায় বসে তিন জন চা-নাস্তার পর্ব শেষ করেন। অতঃপর ভোর থাকতেই সঙ্গী দু'জনকে বন্দুক নিয়ে পাশ্ববর্তী সমতল ভূমিতে পাহাড়ি মোরগের সন্ধানে পাঠিয়ে দেন। নিজে একটি গাছে হেলান দিয়ে আয়েশ করে সিগারেট টানার ফাঁকে সদ্য শীতকালীন শিশির অবমুক্ত জঙ্গলের নয়নাভিরাম দৃশ্য অবলোকন করতে থাকেন।

হঠাৎ দেখেন ২৫/৩০ গজ দূরত্বে মাঝারি আকারের একটি ভালুক জঙ্গল হতে বের হয়ে অপলক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। চট্টগ্রামের এ অঞ্চলের ভালুক খুবই প্রতিহিংসাপরায়ণ, তবে বুদ্ধিমত্তায় বেশ অনুন্নত। ভালুকটি আচমকা রশিদ মিয়ার দিকে অগ্রসর হতে থাকে এবং ১৫/২০ গজ দূর হতে আলিঙ্গন করার ভঙ্গিতে দ্রুত ছুটে আসতে থাকে। এ আলিঙ্গন যে মধুর আলিঙ্গন নয়, লম্বা নখ আর দাঁত দিয়ে মানুষকে ফালা-ফালা করা ভালুকীয় কায়দায় আলিঙ্গন তা অনুমান করতে রশিদ মিঞার দেরি হয়নি। ভালুকটি তার হেলান দেয়া গাছটির কাছাকাছি পৌঁছার পূর্বক্ষণেই তড়িৎ গতিতে তিনি গাছটির পিছনে চলে আসেন। ওদিকে ভালুকটি এসেই গাছটি জড়িয়ে ধরে। সঙ্গে সঙ্গে রশিদ মিয়া ওটার সামনের দু'পা ধরে ফেলেন এবং গাছটি মধ্যখানে রেখে সজোরে ভালুকটিকে টানতে থাকেন। এর মধ্যে কবির ও ফজল নাম ধরে সজোরে চিৎকার করতে থাকেন। এ অবস্থায় ভালুকটি ভেবাচেকা খেয়ে গাছটির চারদিকে ঘুরপাক খেতে থাকে। রশিদ মিঞাও নাছোড়বান্দা। ওটার সামনের পা দু'টি সামান্যতম শিথিল না করে গাছটির মধ্যখানে রেখে ওটা নিয়ে ঘুরপাক খেতে থাকেন। ইতোমধ্যে

ওনার সঙ্গীরা এসে একটি রশি দিয়ে ওটাকে বেঁধে ফেলে। ভালুকটি তারা জ্যান্ত গ্রামে নিয়ে এসেছিলেন।

এর কিছুদিন পর তিনি ভয়াল ভৌতিক এক পরিস্থিতির মোকাবেলা করেন। অবশ্য অতি বাস্তববাদীরা অদ্ভুত এবং অবিশ্বাস্য ঘটনা বলে এসব বিশ্বাসও করবে না। সাতবাড়িয়ার ওবাইদ সওদাগর নামের একজন কাঠ ব্যবসায়ী চিমবুক পাহাড়ের পাদদেশে (নিলামের মাধ্যমে) সরকারের পাহাড়ি গাছ কাটার অনুমতি পান। ঐ স্থানে গাছ কাটার জন্য প্রথমে মহিষখালি পরে বাঁশখালির কাইতাং এর দল (স্থানীয় ভাষায় গাছ কাটার লোকজনকে কাইতাং বলা হয়) নিয়োগ করেন। দু'দলই ভূতের ভয়ে কাজ ছেড়ে চলে যায়। তারা সওদাগরকে জানায় যে, গাছ কাটার জন্য তারা প্রাণ দিতে পারবে না, 'জান থাকলে জাহান' ইত্যাদি ইত্যাদি। ওদিকে তার জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত হবে সময় মত গাছ কাটতে না পারলে, এ ভয়ে সওদাগর বহু কষ্ট করে পুনরায় কাইতাং এর দল যোগাড় করেন। পরে অনেক অনুরোধ করে রশিদ মিঞাকে ওখানে যেতে রাজি করান এবং সওদাগর নিজেও তাদের সঙ্গী হন।

অকুস্থলে পৌছে তারা দেখেন বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে গর্জন এবং গামার গাছের মাঝখানে জলাশয়ের ধারে একটি খালি জায়গা। পূর্বের গাছ কাটার দল ছোট ছোট ঘর তৈরি করে থাকার জায়গা করেছিল। সূর্যাস্তের পর সওদাগর পরবর্তীতে নিয়োগকৃত গাছকাটার দলকে কয়েকটি ঘরে থাকতে বলেন। সওদাগর ও রশিদ মিঞা তাদের বন্দুক নিয়ে মাঝামাঝি একটি ঘরে থাকার ব্যবস্থা নেন। তিনি অবশ্য তার আগে তার নিজের বক্তব্য অনুসারে, দোয়া-দরুদ পড়ে ঘরটা ভালোভাবে নিরাপদ করে রাখেন। রাত ৯টার পর শুরু হয় ভয়ঙ্কর ভৌতিক তাণ্ডবলীলা। হঠাৎ তারা দেখতে পান চারিদিকে ঝড়ের মতো বাতাস বইতে শুরু করেছে, যদিও আকাশে মেঘের কোন চিহ্নমাত্রও ছিল না। পরক্ষণে দেখেন সমস্ত গাছপালা মাটিতে শুয়ে পড়েছে এবং দুমড়েমুচড়ে ওগুলো ভেঙ্গে একাকার হয়ে যাচ্ছে। তিনি বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করলেন, এতে অবশ্য কিছুক্ষণের জন্য তাণ্ডবলীলা শান্ত হয়ে যায়। একটু পর আবারও ভুবন কাঁপানো নানান প্রকার বিকট শব্দ করে পুনরায় ভৌতিক কাণ্ড শুরু হয়ে যায়। এভাবে বন্দুকের গুলি বনাম দিকবিদিক কাঁপানো ভৌতিক খেলায় কয়েক রাত অতিবাহিত হয়। ইতোমধ্যে সওদাগর দূরবর্তী গ্রাম্য লোকজনদের সাথে পরামর্শ করেন। যেহেতু জায়গাটি নাকি মুরুম ও চাকমাদের শ্মশান ছিল, তাদের উপদেশ মত কাঙালি ভোজেরও ব্যবস্থা নেন। এর পর অবশ্য ভূতেরা রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে যায়। রশিদ মিঞার এসব কর্মকাণ্ড নিঃসন্দেহে তার সাহসের প্রমাণ রাখে।

তার বেশ কয়েকটি শিকারের ঘটনার মধ্যে দোহাজারি কয়েক মাইল পূর্বে লালাটটিয়ায় ১৯৬৫ সালে একটি বাঘ শিকার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি

হরিণ শিকারের জন্য ফজল ও সিদ্দিক নামের দু'জন শিকার সহকারীকে নিয়ে লালাটটিয়ার বেগুন ক্ষেতে ওতপেতে বসেন। রাত ১টার মধ্যেও হরিণের কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে ওনার অভ্যাসমত সঙ্গীদের নিয়ে হেঁটে হেঁটে শিকার করতে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়েন। পূর্বদিকে বেশ কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর দূরবর্তী একটি পাহাড়ে তারা আচমকা হরিণের ডাক শুনতে পান। ডাক লক্ষ্য করে তিনজনেই সেদিকে এগুতে থাকেন। প্রায় আধা মাইল পর্যন্ত ঘন জঙ্গলে আবৃত বনভূমি অতিক্রম করার পর সরু পথ ধরে তারা একটি উপত্যকার দিকে উঠতে থাকেন।

লক্ষ্যস্থানের কাছাকাছি আসতেই তারা হরিণটির ভয়ার্ত ডাক শুনতে পান। সাথে সাথে বাঘের রক্ত হিম করা গর্জন শুনে তাদের বুঝতে দেরি হয় না যে শিকার হাত ছাড়া হওয়ায় সাংঘাতিকভাবে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে বাঘটি। অতি সন্নিকট হতে ভুবন কাঁপানো বাঘের গর্জন শুনে রশিদ মিঞার শিকার সঙ্গী দু'জন নিচের দিকে দৌড়ে নামতে শুরু করেন। কিন্তু বেসামাল হয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে প্রায় ২৯ ফুট নিচে একটি ঝরণার ধারে পড়ে যায়। সে স্থানে তারা জড়োসড়ো হয়ে বসে পড়ে। এদিকে ক্ষিপ্ত বাঘটি আরও একবার গর্জন করে দ্রুত রশিদ মিঞার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। তিনি এ অবস্থায় একটি পাহাড়ি কলা গাছ পেছনে রেখে এক নালা বন্দুক নিয়ে বাঘটির মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান।

লং রেঞ্জ এলজি কার্টিজ ভর্তি এক নালা বন্দুক দিয়ে সামনাসামনি রয়েল বেঙ্গল টাইগারের সাথে মোকাবেলা করা নিঃসন্দেহে সাহস ও সামর্থ্যের সীমা ডিঙ্গিয়ে যাচ্ছিল। যদিও তিনি ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তবুও তার অন্য কোন উপায় ছিল না। কারণ তার সঙ্গীরা হৈ চৈ করাতে ক্ষিপ্ত বাঘটির নিকট তাদের অস্তিত্বও আর গোপন ছিল না। এদিকে ছুটে আসছে যমদূত। তখন স্নায়ুর উপর প্রচণ্ড চাপ ঠাণ্ডা মাথায় সম্বরণ করে সাহসিকতার সাথে ভয়কে জয় করে নিজেদের রক্ষা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান তিনি। একটু পরই ১০-১৫ গজ দূর হ'তে প্রজ্জ্বলিত দুটি টর্চের মত জ্বলে ওঠে মস্তকসহ বাঘের দু'টি চোখ। বন্দুকের সাথে ফিট করা শক্তিশালী টর্চে টিপ দিতেই বাঘটি পরিষ্কার দেখা যায়, মাটিতে লেজের বাড়ি দিতে দিতে লাফ দেওয়ার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। মাথা লক্ষ্য করে গুলি করতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ উনার মনে হ'ল যদি কোন কারণে টার্গেট মিস হয় তবে কেউ আর রক্ষা পাবে না। বাঘটির বুক সই করে ট্রিগারে টান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজ স্থান থেকে বাম দিকে লাফিয়ে ৪-৫ হাত দূরে সরে পড়েন তিনি। তিনি সঠিক ধারণা করেছিলেন যে, বাঘটি আহত হয়ে নিচের দিকে আলোর উৎস লক্ষ্য করে লাফ দিবে এবং ঠিক তাই হয়। বন্দুক গর্জে ওঠার মুহূর্তের মধ্যে রশিদ মিঞার স্থান লক্ষ্য করে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঘটি। শিকারিকে সে স্থানে না পেয়ে ঐ

জায়গার কলাগাছটি আঁকড়ে ধরে আহত বাঘটি এবং সজোরে টান দিয়ে ওটাকে উপড়ে ফেলে। চক্ষের পলকেই ঘটনাটি ঘটে যায়। পাশ থেকে টর্চ জ্বালাতেই রশিদ মিঞা দেখেন বাঘটি আহত অবস্থায় বীভৎস চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। ইতোমধ্যে দ্বিতীয় গুলি লোড করে নিয়েছিলেন, মাথা লক্ষ্য করে দ্বিতীয় গুলি করে বাঘটিকে সম্পূর্ণরূপে ধরাশায়ী করেন। বাঘটি লেজসহ প্রায় ১০ফুট লম্বা ছিল।

বাঘ শিকারের আরও অনেক বৈচিত্র্যময় ঘটনা আছে রশিদ মিঞার জীবনে। তবে গরু মহিষ হত্যা করে যখন কোন বাঘ ত্রাস সৃষ্টি করত এবং জনপদ অতিষ্ঠ করে তুলত, তখনই তিনি ওগুলো শিকার করতেন। বিনা কারণে বাঘ মারা তিনি পছন্দ করতেন না। তার এমনও রাত্রি কেটেছে যে গাছের ডালের উপর বসে হরিণের অপেক্ষা করছিলেন। এ অবস্থায় অনতিদূরে বন্দুকের রেঞ্জের মধ্যে একটি বাঘও এসে শুয়েছিল। তিনি দেখতে পেলেও বাঘটি শিকারির অস্তিত্ব সম্বন্ধে বেমালুম ছিল। এ অবস্থায় সূর্যোদয়ের পূর্বে বাঘটি নিরাপদে চলে যায়।

জঙ্গলের বিভীষিকা বলতে অনেক শিকারির মতই তিনিও জঙ্গলের বিষাক্ত সাপকে মনে করেন। জঙ্গলের সাপের ভয়ঙ্কর ছোবল হ'তে নিজেকে রক্ষা করে ওগুলো হত্যা করা তার সাহস এবং বুদ্ধির প্রমাণ রাখে। বাঁশখালির পাহাড়ে এরূপ এক ভয়ংকর সাপের কবলে পড়েছিলেন তিনি। জনমানবশূন্য দেওয়ালের মত খাড়া বাঁশখালির কিছু কিছু পাহাড়ে ২-৩ মণ ওজনের পাহাড়ি ছাগল পাওয়া যায়। বিটিং করে পাহাড়ি ছাগল তাড়া করে শিকার করার জন্য রশিদ মিঞা একবার শিকারি দল নিয়ে বাঁশখালির পাহাড়ে যান। অন্যান্য বন্দুকধারীরা পাহাড়ের একদিকে বসেছিলেন আর তিনি একাকী পাহাড়টির অন্যদিকে ঢালু স্থানে পাহাড়ি ছাগলের অপেক্ষায় বসেছিলেন। সামনের দিক থেকে ছাগল বিটিং করে নিয়ে আসছিল বিটারের দল। হঠাৎ তার ডান পাশে প্রায় ২৫ গজ দূরে দেখতে পান কে যেন শুকনো পাতায় ঝাড় দিচ্ছে। ভালো করে তাকাতেই দেখেন একটি সুপারি গাছের মত সাদা সাপ আঁকাবাঁকা হয়ে আছে এবং অপলক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে রশিদ মিঞার দিকে তাকিয়ে আছে। ওটার লেজ নাড়া দেখে ভ্রান্ত ধারণা হয়েছিল, মনে হচ্ছিল কে যেন পাতায় ঝাড় দিচ্ছে।

ভয়ঙ্কর এ সাপটির ছোবল হতে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র উপায় ছিল এ স্থান থেকে পালিয়ে যাওয়া । কারণ ফায়ার করলে ওদিকে ছাগল শিকারে ব্যাঘাত ঘটবে, তাই তিনি উঠে দৌড় দেয়ার চেষ্টা করেন । কিন্তু তার পায়ের হালকা বাটা জুতা স্লিপ করাতে নিজ স্থানেই পড়ে যান। তার এ নড়াচড়া দেখে পলকের মধ্যে বিদ্যুৎ গতিতে রশিদ মিঞার ২-৩ গজের মধ্যে সাপটি চলে আসে এবং ছোবল

দেয়ার জন্য মাথা তুলতে থাকে। এদিকে একই গতিতে রশিদ মিঞাও বন্দুক উঠাতে থাকেন সাপটিকে লক্ষ্য করে। ছোবল দেয়ার পূর্ব মুহূর্তেই গর্জে ওঠে বন্দুক। পাহাড় জঙ্গল দুমড়ে মুচড়ে একাকার করে সাপটি নিচে পড়ে যায়। ওটার মাথা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। সাপটি প্রায় ২০ ফুট লম্বা ছিল। স্থানীয় ভাষায় এগুলোকে 'হস্তুর' সাপ বলা হয়। অত্যন্ত বিষাক্ত প্রজাতির এ সাপ রাগী ও হিংসাপরায়ণ। দক্ষিণ চট্টগ্রামের জঙ্গলে এগুলোকে দেখতে পাওয়া যায়।

অন্য এক রাতে তিনি ফজল করিম নামের একজন সঙ্গীসহ শিকারের প্রত্যাশায় চুপি চুপি মন্থর গতিতে জঙ্গলের অভ্যন্তরে হাঁটছিলেন, হঠাৎ মাঝারি আকারের কালো কোবরা জাতীয় একটি সাপের (স্থানীয় লোকজন এগুলোকে "কালান্তর" সাপ বলে) মাথার কাছাকাছি তার পায়ের পাড়া পড়ে। সাপটি তৎক্ষণাৎ শরীর দিয়ে রশিদ মিঞার পা দু'টি পেঁচিয়ে ফেলে এবং সজোরে চাপ দিতে থাকে। ফলে স্থির হয়ে দাঁড়ানোও তার পক্ষে কষ্টকর মনে হচ্ছিল। তথাপিও একটুও পা আলগা না করে তিনি সঙ্গী ফজল করিমকে দু'পায়ের মধ্য দিয়ে সাপটি কেটে ফেলতে বলেন। এভাবে এক মহাবিপদ হতে তিনি রক্ষা পান। সাপটির শরীরের অন্য কোন স্থানে যদি তার পাড়া পড়তো তবে রক্ষে ছিল না । জঙ্গলের কালান্তর সাপ খুবই রাগী এবং বিষধর। এগুলোর আবাসস্থলের ত্রিসীমানায় কোন প্রাণী দেখলে বিদ্যুৎ বেগে তাড়িয়ে নিয়ে যায়।

অনেক সময় আবার এমনও দেখা গেছে মানুষ দেখলেই মাথার উপর ফণা তুলে ছোবল দেয়ার জন্য তাড়িয়ে নিয়ে যায়। এ অবস্থায় যদি লোকটি মূর্তির মতো স্থির দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, তবে অহেতুক ছোবল না দিয়ে মাথার ওপর থেকে ফণা নামিয়ে সাপ ধীরে ধীরে সরে পড়ে। এরূপ একটি ঘটনা ঘটেছিল রশিদ মিঞার সাথে। চৈত্রের খরা রোদে পাহাড়ি ঝর্ণার মধ্য দিয়ে হাঁটার সময় একটি কালান্তর সাপ হঠাৎ কোথা থেকে এসে তার মাথার ওপর ফণা তুলে ওঠে। সাপটি ছিল বেশ বড় এবং দৌড়ে রক্ষা পাওয়ারও কোনও সুযোগ ছিল না। উপায়ান্তর না দেখে তিনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। কোন ক্ষতি না করেই সাপটি চলে যায়। এসব ঘটনা-প্রবাহের আলোকে অবলীলায় বলা চলে, জঙ্গলের অনেক ভয়াবহ চমকপ্রদ ঘটনার নায়ক ছিলেন তিনি। এজন্যই তিনি একজন সাহসী শিকারি হিসেবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন তার এলাকায়।

সোনাদিয়ার সেই হাতিটির কথায় আসা যাক! পূর্বেই বলা হয়েছে হাতিটির দৌরাত্ম্য বেড়ে গিয়ে এতই বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিল যে ঐ সময়ের সোনাদিয়ার জঙ্গলে প্রবেশ করতে জনগণ রীতিমত ভয় পেত। উক্ত এলাকায় হাতিটি ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছিল, কারণ মানুষ নিধন করা যেন হাতিটির নেশায় পরিণত হয়েছিল। অসতর্কভাবে জঙ্গলে ঢুকে ইতোমধ্যে আরো অনেক লোক বেঘোরে

প্রাণ হারিয়েছে। অতি প্রয়োজনে ৭-৮ জন লোক মিলে দল বেঁধে জঙ্গলে যেত। যা আবার সব ক্ষেত্রে সম্ভব হতো না। এদিকে জঙ্গলের সাথে যাদের জীবিকার সম্পর্ক তাদের কষ্টের ইয়ত্তা ছিল না। জনগণের ভোগান্তি যেন সেই সময়ে এক চরমে এসে পৌছায়। জঙ্গলে কাঠুরিয়াদের কাঠ কাটা, চাষীদের চাষাবাদ, দিনমজুরের দৈনিক কাজ এবং বাঁশ গাছ কাটা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় রশিদ মিঞা মনে করলেন জনগণের অনুরোধ আর উপেক্ষা করা যায় না। পীর ভক্ত রশিদ মিঞা ওনার পীর মুরশীদের দরবারের অনুমতি ও দোয়া নিয়ে হাতিটি নিধন করতে সাধ্যমতো চেষ্টা করার সংকল্প নেন।

এর মধ্যে বাঁশখালির চূড়ামনির ঢালায় (গিরিপথ) হাতিটির পায়ের ছাপ দেখা গেছে বলে রশিদ মিঞার কাছে খবর আসে। একদিন পর প্রত্যুষে নিজ বন্দুক নিয়ে একজন শিকারি সঙ্গীসহ হাতিটির খোঁজে যাত্রা করেন। শিকার সঙ্গীটির নাম ছিল "ফুইন্যা"। তার প্রকৃত নাম নাকি ফাহিন মিঞা। নাম বিকৃত হতে হতে চরম পর্যায়ে ফুইন্যাতে রূপান্তরিত হয়েছে। অবশ্য নাম বিকৃত করে সংক্ষেপে সম্বোধন করা গ্রামবাংলার একটি চিরাচরিত প্রথা। ঢালার অভ্যন্তরে রশিদ মিঞা প্রায় অর্ধেক মাইল হাঁটার পর হাতির পায়ের ছাপ দেখতে পান। ছাপটি বেশ কিছু দিন আগের, তবে ছাপটি যে ঘাতক হাতিটির এতে কোন সন্দেহ ছিল না। যে নালার পথ দিয়ে হাতিটি গেছে সেদিকেই উঠতে লাগলেন তারা। কিছুদূর এগুবার পর ডান দিকে জঙ্গলের মধ্যে একটি ভারী জন্তুর নড়াচড়া লক্ষ্য করলেন দু'জনেই। বনানীর একটি স্থানে আলোড়ন সৃষ্টি হয় কিছু একটা নড়াচড়ার কারণে। অতি সন্তর্পণে জঙ্গল ঠেলে তারা কাছাকাছি গিয়ে দেখেন একটি মস্ত বড় অজগর সাপ হরিণ কিংবা তৎসমান কিছু ভক্ষণ করে সেটি হজম করার জন্য গড়াগড়ি দিচ্ছে। সাপটির কাজে কোন প্রকার ব্যাঘাত না ঘটিয়ে ওটার কাছে যে ভাবে গিয়েছিলেন সেভাবে আবার ফিরে আসেন দু'জনেই। এর পর নালাটির আরো উজানে বেশ কিছুদূর হাতিটির খোঁজে হাঁটতে থাকেন তারা। তবে হাতিটির পুরানো পায়ের ছাপ কিছুই তাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি।

৫-৬ মাইল এলাকা জুড়ে গহিন জঙ্গলে আবৃত দুর্গম উঁচু নিচু পাহাড়ি এলাকায় কোথায় যে ঘাতক হাতিটি আত্মগোপন করে আছে তা খুঁজে বের করা বিপদসংকুল এক দুরূহ ব্যাপার। মানুষ খেকো বাঘ জঙ্গল হতে খুঁজে বের করা সহজ, কারণ বাঘ মানুষ হত্যা করে শুধু ক্ষুধা নিবারণের তাগিদে, আর হাতি মানুষ হত্যা করে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য। বাঘ নরঘাতক হলেও গরু মহিষের টোপে আকৃষ্ট হয় এবং মড়িতেও ফিরে আসে। নরঘাতক হলে এরকম কিছুতেই হাতিকে আকৃষ্ট করা যায় না। তদুপরি শর্ট গান বা কার্তুজ বন্দুক দিয়ে এ দানব হত্যা করাও এক অসম্ভব ব্যাপার। শর্ট গান দিয়ে উল্লিখিত হাতিকে মারতে গিয়ে

ইতোপূর্বে অনেক শিকারি শুধুমাত্র হাতিটাকে ঘায়েল করেছে এবং ভাগ্যক্রমে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছে। হাতিটি দিনের বেলায় সোনাদিয়ার কলাইরঘোনা নামক স্থানের একটি সরোবরে থাকে বলে অনুমান করা যায়, কিন্তু রাত্রিতে ঐ এলাকার সর্বত্র ঘুরে বেড়ায় বলে লোকজনের ধারণা। আবার কখনও কখনও কিছুদিনের জন্য উধাও হয়ে যায়। পূবোল্লিখিত নালাটি (ঝর্ণা) কলাইরঘোনার থেকে বেশি দূর নয়। তাই জায়গাটির উদ্দেশ্যে পরের দিন ফুইন্যাকে নিয়ে তিনি আবার যাত্রা শুরু করেন।

ভোর হওয়ায় পূর্বেই তারা ঐ জায়গার একটি খালের নিকট এসে পৌছান। সেদিনও আবার করে বসেন রাইফেল ছাড়া শর্ট গান নিয়ে হাতি শিকার করতে যাওয়ার মতো ভুল। ফুইন্যাকে পিছনে রেখে খালের এক বাঁক দু'বাঁক করে এগুতে থাকেন তারা। বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর হঠাৎ দেখেন ঘোলা পানি আসছে সামনের দিক থেকে। খালটির একদিকের পাড় খাড়া পাহাড়, অন্যদিকে ১০-১২ হাত উপরে সমতল বনভূমি। কালবিলম্ব না করে সমতল ভূমির দিকে উঠে নিরাপদ দূরত্বে লুকিয়ে বসে পড়েন দু'জনেই। অল্পক্ষণের মধ্যে শোনা গেল পানিতে পত পত শব্দ করে হেলে দুলে পা ফেলে আসছে বিশাল দেহী ঐরাবত। এদিকে রশিদ মিঞাও বন্দুক নিয়ে প্রস্তুত। বাঁক ফিরতেই প্রথমে ওটার বিশাল মস্তক দেখা যায়। কাছাকাছি আসতেই একপাশ থেকে মাথা বরাবর লক্ষ্যকরে শর্টগান দিয়ে বুলেট ফায়ার করলেন। সংগে সংগে চিৎকার করে দু'পা উপরে তুলে আবার বসে পড়লো হাতিটা। তাড়াতাড়ি আরো দূরে সরে পড়লেন দু'জনেই। টার্গেট মিস না হলেও সঠিক স্থানে গুলি যে লাগে নি এবং আঘাত গুরুতর হয়নি তা ওটার ফিরে যাওয়ার চলন ভঙ্গিমা দেখে বোঝাই যাচ্ছিল। দূর থেকে দেখলেন হাতিটি উঠে যে দিক থেকে এসেছে সেদিকেই চলে যাচ্ছে।

অতঃপর কিছু দিনের জন্য পুরো অঞ্চলে ওটার উৎপাত বন্ধ হয়ে যায়। এ সময়ে এক কাঠুরিয়া আপদ দূর হয়েছে মনে করে তার আট বছরের একটি মেয়ে নিয়ে পাহাড়ে কাঠ কুড়াতে যায়। দুর্ভাগ্য তাদের, পিছন থেকে হাতিটি এসে শুধু বাবাকে হত্যা করে ক্ষান্ত হয়নি বরং তার ছোট মেয়েটিকেও রেহাই দেয়নি। এ খবর পেয়ে রশিদ মিঞা আবার নতুন উদ্যমে হাতিটির পিছনে ধাওয়া শুরু করলেন। বরাবরের মতো ফুইন্যাকে নিয়ে যে স্থানটিতে হাতিটিকে গুলি করেছিলেন সে জায়গাটির উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। সূর্য ওঠার পরপরই তারা দু'জনে ওখানে গিয়ে পৌঁছেন। অকুস্থানে পৌছেই পাহাড়ের দিকে তাকাতেই দু'জনে হতবাক হয়ে যান। মৃত্যুদূত জঙ্গলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দূর থেকে অপলক দৃষ্টিটে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। মুহূর্তের মধ্যে পিছনের দিকে ঘুরে দু'জনেই

দেদৌড়। ভাগ্য তাদের ভালো কাছাকাছি জুতসই একটা গর্জন গাছ পেয়ে যান। হাতির নাগালের উর্ধ্বে উঠে গাছটির শক্ত ডালে বসে পড়েন দু'জনেই, উপরে ফুইন্যা আর নিচে রশিদ মিঞা।

দেখতে না দেখতেই হাতি গাছের নিচে এসে হাজির। গাছটির চারপাশে একবার প্রদক্ষিণ করে গাছটি ঠেলতে আরম্ভ করে হাতিটি। এসময় ফায়ার করার ভাল একটা সুযোগ পাবেন আশা করে বসেছিলেন রশিদ মিঞা। হঠাৎ মনে হলো কে যেন তার মাথায় গরম পানি ঢালছে। তবে তার বুঝতে বাকি রইল না, এ কিছুই নয়, ফুইন্যা ভয় পেয়ে প্রস্রাব করে দিয়েছে রশিদ মিঞার মাথার উপর। ক্রোধে এবং ঘৃণায় রাগান্বিত ও অতিষ্ঠ হয়ে ফুইন্যাকে গালিগালাজ করতে লাগলেন তিনি। ইতোমধ্যে হাতিটি নিকটবর্তী নালার দিকে চলে যায়। পরক্ষণেই ফিরে এসে শুঁড়ে করে আনা পানি গাছের গোড়ায় ঢালতে থাকে এবং সেখানে পা দিয়ে পাড়াতে আরম্ভ করে। এদিকে রশিদ মিঞা বিরক্তিকর অবস্থায় গাছের উপর থেকে হাতির মস্তক লক্ষ্য করে গুলি ছোড়েন। বন্দুকে এল জি লোড করা ছিল সেটি আর বদলানো সম্ভব হয়নি। এ অবস্থায় গুলির আঘাতে কিছুটা আহত হয়ে হাতিটি দৌড়ে পালিয়ে যায়।

সোনাদিয়ার দক্ষিণ দিকের কয়েকটি পাহাড়ি অঞ্চল যেমন আনারস বন্যা, বাঘ খাইয়া, শয়তানের ঢেফা, পাগলির ঘোনা, চূড়ামনির ঢালা–এসব বিস্তীর্ণ এলাকার গহিন জঙ্গলে প্রায় সময় হাতিটি বিচরণ করে বলে শোনা যাচ্ছিল। তবে সোনাদিয়ার অঞ্চলে অনেক স্থানে জনসমাগম বেশি, জঙ্গলও তত গহিন নয়। সর্বোপরি এগুলোর খাদ্যের অপ্রতুলতার কারণে হয়তো বেশিদিন এ এলাকায় হাতি থাকে না। কিন্তু এ ঘাতক হাতিটি এ অঞ্চল ছেড়ে অজানা কোন কারণে যেতেও চায় না।

ইতোমধ্যে খবর পাওয়া যায় যে বাঘখাইয়া ও শয়তানের ঢেফা নামক জায়গার মধ্যবর্তী স্থানে, গহিন জঙ্গলে হাতিটাকে প্রায়ই দেখা যায়। দূর থেকে কলা গাছ এবং পাহাড়ি তরুলতাসমৃদ্ধ স্থানে কয়েকজন লোক ওটাকে দেখেছে। এরই মধ্যে কয়েকবার চূড়ামনির ঢালা দিয়ে অতিক্রমকারী পথিকদের হাতিটি আক্রমণ করেছে তবে কারো কোন ক্ষতি করতে পারেনি বলে খবর পাওয়া গেছে। এদিকে রশিদ মিঞার ভুলও ভেঙ্গেছে যে, তার শর্ট গান দিয়ে এ দানবকে খতম করা সম্ভব নয়। তাই রাইফেল খুঁজতে লাগলেন এবং পেয়েও গেলেন। তবে শর্ত ছিল রাইফেলের মালিক কিংবা উনার লোক হাতি শিকারের সময় সাথে থাকবেন, শিকার অবশ্য রশিদ মিঞাই করতে পারবেন।

হাতিটি শিকারের জন্য রাইফেলের মালিকের লোক এবং ফুইন্যাসহ মোট ৫ জনের এ দলটি কয়েকদিন পরে উল্লিখিত স্থানটির দিকে রওয়ানা হয়। গন্তব্য

স্থানে তাড়াতাড়ি পৌছবার লক্ষ্যে ভোর বেলায় শিকারির দল জনবসতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। ৩-৪ মাইল পথ অতিক্রম করলেই পাহাড়টিতে পৌছা যায়, যেখানে হাতিটি থাকার তাজা খবর পাওয়া গেছে। শয়তানের ঢেফার দিকে শিকারি দলটি যাচ্ছে দেখে জনগণ এই বলে সতর্ক করে দিতে থাকে যে, "জঙ্গলের অভ্যন্তরে শিকার করতে যাবেন না, পাগলা হাতিটা আশেপাশেই আছে।" তাদেরকে কোন উত্তর না দিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন তারা। জঙ্গলের অভ্যন্তরে পাহাড়ি রাস্তা ধরে কিছুদূর যেতেই তারা দেখতে পান যে, কাঠুরিয়ার দল হন্তদন্ত হয়ে ফিরে আসছে গ্রামের দিকে। তারা শিকারি দলকে জানায় যে, সামনের উঁচু পাহাড়ের পশ্চিম পাদদেশে পাগলা হাতিটা দেখা গেছে, আরও বলে হাতিটা সাংঘাতিক শয়তান এবং নরঘাতক। শিকার না করে ফিরে যাওয়ার জন্য তারা শিকারি দলকে অনুরোধ জানায়।

কিছুদূর অগ্রসর হতেই উল্লিখিত পাহাড়ের পূর্বদিকের পাদদেশে পৌছে যায় শিকারি দলটি। ওটা ছিল একটি বড় উঁচু পাহাড়। পাহাড়টি পূর্ব-দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের কিছু অংশ নিয়ে খাড়া তিন দিকে বেষ্টিত হয়ে আছে। মধ্যখানে গহিন জঙ্গল এবং সমতলভূমি যা উত্তর-পশ্চিম দিকে বিস্তৃত হয়ে আছে। তিন দিকে পাহাড়ি ঢালু মধ্যবর্তী জায়গা পাহাড়ি কলাগাছ, তরুলতায় আচ্ছাদিত। তারা অতি সাবধানে পূর্ব দিক থেকে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে জঙ্গলের আড়ালে এক জায়গায় বসে পড়েন। জায়গাটির পাহাড়ি গাছপালা, কলাগাছ ইত্যাদি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে পাঁচ জনই চারদিকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। দানবটি যে এ স্থানে আছে এতে তারা মোটামুটিভাবে নিশ্চিত হন। ঠিকই তাদের দৃষ্টি এড়ালো না, দেখা গেল দক্ষিণ দিকে খাড়া পাহাড়ের এক স্থানে অতি সন্তর্পণে পাহাড়ি কলাগাছ এবং লতাপাতা খাচ্ছে হাতিটি।

তিন জনকে সে স্থানে সাবধানে বসে থাকতে নির্দেশ দিয়ে রাইফেল হাতে ফুইন্যাসহ নিচের দিকে নেমে এলেন রশিদ মিঞা। ফুইন্যা যদিও খুব ভিতু লোক, তবুও সে অত্যন্ত বিশ্বাসী বলে তাকে সাথে রাখতে তিনি পছন্দ করতেন। দক্ষিণ দিকে ঘুরে গিয়ে হাতিটির বরাবর উপরে উঠলেন তারা। এদিকে তিন জনের অপেক্ষমাণ দলটির প্রতি নির্দেশ ছিল, যদি হাতিটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে দূরে সরে যায় তবে তারা যেন সাদা কাপড় বাঁধা গাছের ডাল উত্তোলন করে সংকেত দেয়। উপরে ওঠার পর এরূপ কিছু না দেখে হাতিটা পূর্বের স্থানে আছে তাতে তিনি নিশ্চিত হন। একটু সামনে এসে উঁকি দিতেই হাতিটিকে দেখতে পান রশিদ মিঞা। ফুইন্যাকে ঐ স্থানে বসে থাকতে বলে চুপি চুপি হাতিটির প্রায় ২৫-৩০ গজের মধ্যে এসে তিনি বসে পড়েন। এর পর দু'এক বার কাশির শব্দ করে

হাতিটির নিকট নিজের অস্তিত্ব প্রকাশ করার চেষ্টা করলেন তিনি। এতে কোন কাজ হলো না, হাতিটি এদিকে ভ্রুক্ষেপও করল না। পরে বলে উঠলেন "মামা তোমার সাথে মোলাকাত করতে এসেছি" আস। এ অঞ্চলে হাতিকে অবশ্য ঠাট্টা করে অনেকে মামা সম্বোধন করে।

মানুষের আওয়াজ কানে পৌছতেই কলাগাছ খাওয়া বন্ধ করে দেয় হাতিটি। হয়তোবা ভাবতে থাকে "এত বড় সাহস কোন বেয়াদব মানব সন্তানের"– তবে যাই চিরতরে শায়েস্তা করে আসি। এর পর সোজা শব্দ বরাবর উপরে উঠতে শুরু করে দানবটি। প্রায় ১৫ গজের মধ্যে আসতেই হাতিটির মাথা বরাবর টারগেট করে রশিদ মিঞা রাইফেলের ট্রিগার টান দেন। রাইফেলের গর্জনের সাথে সাথে প্রচণ্ড শক্তিশালী বুলেট হাতিটির মাথা ভেদ করে শিরদাঁড়ার ভিতর দিয়ে কাঁধের মধ্যবর্তী স্থান ভেদ করে বের হয়ে যায়। হাতিটি সম্মুখের যে পা তুলেছিল বেশ কয়েক সেকেন্ড ধরে ও-পাটি ওভাবে ওঠানো থাকে। পরক্ষণেই হাতির বিশাল দেহটি মাটিতে পড়ে যায় এবং গড়াতে গড়াতে পাহাড়ের পাদদেশে পৌছে যায়। অতঃপর শিকার সঙ্গীরা নিচে নেমে দেখে আসেন সোনাদিয়ার বিভীষিকার যবনিকাপতন। সোনাদিয়ার মানবঘাতক এ হাতির হত্যার সংবাদ চারিদিকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

মানুষ জাতির উপর এ হাতিটির কেন এত বিদ্বেষ এবং সাংঘাতিক ঘৃণা জন্মেছিল এ প্রশ্নের বিশদ উত্তর কারো পক্ষে দেয়া সম্ভব ছিল না। মানব জাতির উপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ওটা কেন এভাবে উন্মত্ত হয়েছিল তার সঠিক কারণও বোঝা যাচ্ছিল না। তবে এটুকু শোনা গিয়েছিল যে, দু'টি যোদ্ধা হাতির মধ্যে বাঁশখালি এলাকার পাহাড়ে হুলুস্থুল মারামারি চলছিল বেশ কিছুদিন ধরে। এ সময়ে একটি বড় হাতি পাকা ধান ক্ষেতে আসলে ধান রক্ষার্থে হাতিটিকে কয়েকবার গুলি করা হয়। অনুমান করা হয়, স্বজাতি হাতির নিকট পরাজিত হয়ে বিধ্বস্ত অবস্থায় পাকা ধান ক্ষেতে গিয়ে গুলিতে আহত হয় হাতিটি। উল্লেখ্য যে, উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত বাঁশখালি সাতকানিয়া অঞ্চলের বিস্তীর্ণ পর্বতমালার মধ্যবর্তী স্থানটি হাতির প্রধান বিচরণ ভূমি ও বাসস্থান। স্বজাতির সাথে দ্বন্দ্বে পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে হাতিটি যতই উত্তরের দিকে এগুতে থাকে ততই মানুষ কর্তৃক বন্দুকের গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হতে থাকে। হয়তোবা এজন্যই তার মধ্যে মানুষের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা ও আক্রোশ জন্মেছিল এবং প্রতিহিংসার ইচ্ছায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল।

চেঙ্গির ধূর্ত বাঘ

(শিকারির নিজ বর্ণনা অবলম্বনে)

পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি শহর থেকে দক্ষিণে এবং কাপ্তাইয়ের পূর্ব-দক্ষিণে ননয়্যার চর নামক স্থানটি অবস্থিত। এর পার্শ্ববর্তী পাহাড়ি এলাকাসমূহের মধ্যে মরাচেঙ্গি, বুড়ির ঘাট, সাবেক কং, লেংগেদু, মরিস্যা, মহাপাড় ইত্যাদি পার্বত্য এলাকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিস্তীর্ণ অরণ্যভূমির এ সব এলাকা জুড়ে এক সময় বন্য জীবজন্তুর এমন কোন প্রজাতি ছিল না যা এখানে দৃষ্টিগোচর হতো না। বিগত কয়েক দশক পূর্বেও এখানে অনেক প্রকার জীবজন্তুর সন্ধান পাওয়া যেত। তবে ইদানীং বাংলাদেশের অন্যান্য বনভূমির ন্যায় এখানেও এগুলোর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হতে চলেছে। এসব এলাকায় বিলুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণীর মধ্যে বাইসন, গয়াল, বড় আকারের সাম্বার, রয়েল বেঙ্গল টাইগার এবং বিভিন্ন প্রজাতির বাঘ, শ্বেত এবং ছোট আকৃতির হাতি ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়।

তিন চার দশক পূর্বে ননয়্যার চরের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিশেষ করে মরাচেঙ্গি, সাবেক কং এবং লেংগেদু এলাকার জঙ্গলে অনেক প্রকার হরিণ, বাইসন, শূকর ছাড়াও মোরগ, মতুরা এবং নানান প্রজাতির বন্য শিকার পাওয়া যেত। সে কারণে শিকারিদের যেমন এসকল এলাকা খুবই আকর্ষণীয় ছিল, তদ্রূপ মাংসভোজী বাঘের জন্য ছিল উপযুক্ত আবাসভূমি। এলাকাসমূহের আশেপাশে বহুকাল ধরে আছে পাহাড়ি চাকমা এবং পার্বত্য লোকজনের বসতবাড়ি। কিছু সংখ্যক চাষী আবার এমনও আছে যারা চাষাবাদের মৌসুমে খামার বাড়িতে আসে এবং চাষাবাদ শেষে লোকালয়ে চলে যায়। অনেকে পাহাড় এবং জঙ্গল সংলগ্ন জমিতে চাষাবাদ করে এবং পাহাড়ি অঞ্চলে গরু মহিষ পালন করে। আবার গহিন পাহাড়ে বসবাসকারী চাকমা ও মগরা জুম চাষ করে তাদের প্রয়োজনীয় ধান উৎপাদন করে। তারা এতই স্বনির্ভর যে বাজার থেকে লবণ, তেল ও জামাকাপড় ব্যতীত বাকি সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিজেরাই উৎপন্ন করে এবং নিজেরাই ভোগ করে।

ষাট দশকের মাঝামাঝি সময়ে একটি ধূর্ত বাঘ এ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে উৎপাত আরম্ভ করে। মরাচেঙ্গি গ্রামের চাষীদের গৃহপালিত গরু মহিষ প্রতিদিনের মত একদিন সকালে পাহাড়ি চারণভূমিতে চরাবার জন্য রাখালেরা নিয়ে যায়। জনৈক চাষীর অনেকগুলো গরু এবং মহিষের পাল মরাচেঙ্গি খালের পূর্ব পার্শ্বে

চরাতে নিয়ে গিয়েছিল তার রাখাল মনু মিঞা। সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফেরার পথে মনু মিঞা তার গরু এবং মহিষের পাল একত্রিত করে দেখে যে তার মোটা তাজা দুধের গাভী এবং বাচ্চাটি পালের মধ্যে ফিরে আসেনি। হয়তো দুপুরের দিকে বাচ্চাসহ গাভীটি বাড়িতে চলে গেছে ভেবে মনু মিয়া বাকি গরু মহিষ নিয়ে সন্ধ্যার সময় গ্রামে চলে আসে। রাখাল গাভীটি পায়নি একথা শুনে গরুর মালিক আন্দাজ করে নেন যে তার গরুর কি পরিণতি হয়েছে। কারণ ইতোমধ্যেই আশেপাশে বাঘের উপদ্রবের কথা তিনি শুনেছেন।

ঐ রাত্রে সামান্য খোঁজাখুঁজির পর সকালবেলার জন্য মালিক অপেক্ষা করতে থাকেন। পরদিন ভোরের বেলা চার-পাঁচ জনের একটি সন্ধানকারী দল রওয়ানা দেয় গরুটির খোঁজে। গরু চারণভূমির অপর প্রান্তে একটি পাহাড় পার হয়ে জঙ্গলের পাশেই বাছুরটির ছড়ানো ছিটানো পা এবং মাথা দেখেই তাদের সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়। ওখান থেকেই রক্তের দাগ, ধস্তাধস্তি এবং টেনে হেঁচড়ে নেয়ার চিহ্ন অনুসরণ করে সন্তর্পণে অল্প কিছুদূর এগুতেই বুঝতে পারে যে, গহিন জঙ্গলের ভিতর কাঁধের উপর শিকার নিয়ে বাঘটি ঐ পথ দিয়ে এগিয়ে গেছে। শিকারটি ঐ গাভীটি ছাড়া আর কিছুই নয়। বাঘ হয়তো গাভীটি মারার সময় বাছুরটি মায়ের অসহায় অবস্থা দেখে পালিয়ে লুকাবার চেষ্টা করেছিল, তখন সেটাকে মেরে সাবাড় করে গাভীটিকে নিয়ে আরও দূরে চলে যায় বাঘটি। অতঃপর গাভীটি গভীর জঙ্গলে লুকিয়ে রেখে বাঘ কোথাও উধাও হয়ে যায়। এসব দেখে হতভম্ভ হয়ে যায় সন্ধানকারী দলের লোকজন। পরে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেয় যে, কোন একজন পাকা শিকারিকে বাঘটির ব্যাপারে খবর দেয়া দরকার। তখন তারা সর্বজনবিদিত পার্শ্ববর্তী এলাকার বিখ্যাত শিকারি বাবু চিত্তরঞ্জন নাগকে অবহিত করার জন্যে ঐকমত্যে পৌছেন।

উল্লিখিত স্থানসমূহে প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে শিকারের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং বিভিন্ন লোমহর্ষক ঘটনার সাথে জড়িত কিম্বা ঘটনার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাক্ষী একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন বাবু চিত্ত রঞ্জন নাগ। তিনি চট্টগ্রামস্থ বোয়ালখালি থানার কানোংগ পাড়া কলেজের নিকটবর্তী সাওয়ারতলি গ্রামের অধিবাসী। তার বড় ভাই শ্রী মনমোহন নাগ ছিলেন অত্র এলাকার উনবিংশ শতাব্দীর এক শিকারি এবং জমিদার। তার কাকা শ্রী রমেশ চন্দ্র নাগও বহুকাল ধরে এ সমস্ত এলাকায় শিকার করেছিলেন। বংশপরম্পরায় শিকারের সাথে জড়িত শ্রী চিত্তবাবু শিকার জীবন শুরু করেছেন ১৯৩৮ সাল থেকে। উত্তরাধিকারী সূত্রেই তিনি ৫টি বিভিন্ন প্রকারের শর্টগান এবং ০.৪০৫ বোরের ১টি রাইফেল পেয়েছিলেন। ননয়্যারচরে তাদের বিশাল জমিদারি ছিল বলে তাদের কয়েকটি খামার বাড়িও ঐ এলাকায় ছিল।

যেখানে অবস্থান করে শিকার করা বা ঐ সব জায়গাকে কেন্দ্র করে শিকার পরিকল্পনা করা তাদের নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল।

তাঁর পিতা এবং পিতামহের যুগের তুলনায় তাঁর যুগে শিকারের অপ্রতুলতার জন্য হয়তবা পূর্বসূরিদের মত বেশি পরিমাণ শিকার করার সুযোগ তিনি পাননি। তথাপি তিনি অনেকগুলো ছোট বড় হরিণ, বাঘ, ভালুক ইত্যাদি বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে) শিকার নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত শিকার করেছেন। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোন অতিথি শিকার করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে, চট্টগ্রাম অঞ্চলে তার শিকার সঙ্গী হওয়ার জন্য চিত্ত বাবুই সবার আগে সরকারি অনুরোধ পেতেন। বহুল জনশ্রুত ১৯৫৬ সালের এক পাগল হাতি শিকারের ঘটনা দেওয়া হল। যে শিকার অভিযানে চিত্ত বাবু তদানীন্তন রাঙ্গামাটির ডি সি মিঃ এন এইচ নিভলেট এবং ইরানের শাহের ছোট ভাই এর সাথে শিকার সঙ্গী হয়েছিলেন। তিনি তার হাতি লালবাহাদুরের ওপর বসে পাগল হাতিটিকে গুলি করার সাথে সাথে ক্ষিপ্র গতিতে লালবাহাদুর ঘুরে যায়। এতে অতর্কিত অবস্থায় বেসামাল হয়ে হাতির ওপর থেকে নিচে পড়ে গিয়ে ঘাড় ভেঙ্গে যায়। তিনি তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুতে স্বাভাবিকভাবে অত্র এলাকাতে শোকের ছায়া নেমে আসে। তিনি নাকি হেঁটে হেঁটে বা সাইকেলে চড়ে এলাকার জনগণের খোঁজখবর নিতেন। যে সব লোক নিজ গুণে শাশ্বত হয়ে আছেন তিনিও তাদর মধ্যে অন্যতম ছিলেন।

মরাচেঙ্গির সেই বাঘটির ঘটনায় আসা যাক। চিত্ত বাবু তখন অবকাশ যাপন করতে গ্রামের বাড়িতেই ছিলেন। বাঘের খবর পেয়ে তিনি একজন সহকারী শিকারি এবং একজন মালপত্র বহনকারী লোক নিয়ে সাত মাইল দূরবর্তী চেঙ্গির উদ্দেশ্য রওনা হন। মড়ির কাছে গিয়ে দেখতে পান যে প্রথম বারেই যতদূর সম্ভব গরুটি খেয়েছে এরপর আর মড়িটির ত্রিসীমানায়ও আসেনি বাঘটা। কাছাকাছি জুতসই এক গাছে মাচা তৈরি করে ঐ রাত্রেই একজন সঙ্গীসহ পাহারায় বসে যান চিত্ত বাবু। এভাবে বাঘের বা অন্য শিকারের জন্য মড়ির উপর ওতপেতে বসে সারারাত অপেক্ষা করা চিত্ত বাবুর জন্য কোন নতুন ব্যাপার নয়। মশা ও অন্যান্য উপদ্রবকারী কীটপতঙ্গের জন্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তার সাথেই থাকত। ঐ রাতে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেনি। সকালে পাশ্ববর্তী গ্রামে ফিরে এসে হেড ম্যানের বাড়িতে বিশ্রাম নেন। সেখানে আগে থেকেই ব্যবস্থা করা ছিল বাবুর জন্য। চিত্ত বাবুকে রাখতে পেরে হেড ম্যানও কম খুশি হয়নি সেদিন।

পরদিন গ্রামের লোকজনের সাথে গল্প করার সময় বাঘটি সম্বন্ধে জানতে চাইলে অনেকে বলে গরুর সমান ডোরাকাটা বাঘ একটা তারা দেখেছে , আবার কেউ কেউ বলে মস্ত বড় সুন্দর বাঘ; কিন্তু প্রকৃত ধারণা কেউ দিতে পারে না।

দু'দিন পর গ্রামে ফিরে আসার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, এমন সময় ছয়-সাত মাইল দূরবর্তী সাবেক কং নামক স্থানের অদূরের জঙ্গলে একটি মহিষ বাঘে ধরেছে বলে একজন গ্রামবাসী খবর নিয়ে আসে। সে আরও জানায় চারণভূমিতে সন্ধ্যার সময় থেকে মহিষটির খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। কয়েকজন লোক খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে জঙ্গলের অভ্যন্তরে ওটার সাথে বাঘের ধস্তাধস্তির চিহ্ন দেখতে পায়। মড়িটা নিয়ে যাবার চিহ্ন অনুসরণ করে কিছুদূর এগুবার পর ওরা খালি হাতে বাঘের সামনাসামনি হওয়ার সাহস না পেয়ে গ্রামে ফিরে আসে। তারা সকলেই এ খবর দেয়ার জন্য তাকে চিত্ত বাবুর কাছে পাঠিয়েছেন।

জুলাই মাসে বর্ষার বৃষ্টিতে ভেজা কাদামাটিতে কখনও টিলা পার হয়ে, উঁচু নিচু এবং ঢালু রাস্তা পায়ে হেঁটে ঐ স্থানে পৌছতে প্রায় তিন-চার ঘণ্টা লেগে যায় চিত্ত বাবু এবং তার লোকজনের। সন্ধানকারী দল রাত্রে যে স্থান হ'তে চলে এসেছে সেই স্থানের কিছু সামনে এগুতেই মড়িটা অর্ধভুক্ত অবস্থায় দেখতে পান। তিনি ঐ রাত্রেই পাহারা দেয়ার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু আশেপাশে জুতসই কোন গাছ না থাকাতে প্রায় বার তের হাত উঁচুতে শক্ত করে একটা মাচা তৈরি করে নেন। স্থানীয় রহমত মিঞা নামের একজন শিকারিকে সঙ্গে নিয়ে সূর্য ডোবার পূর্বক্ষণে তারা মাচায় উঠে বসেন। ভ্রমণের ঘোর কাটিয়ে চারিদিকের অপরূপ দৃশ্য অবলোকন করতে করতে সূর্যাস্ত যায়। কিছুক্ষণ পর রাতের ম্লান অন্ধকার। রাত ১১টা পর্যন্ত তাদের দক্ষিণ পার্শ্বে একপাল বন্য শূকর যাতায়াতের শব্দ ছাড়া আর কিছুরই সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। ইতোমধ্যে রহমত মিঞার কয়েক ঘণ্টা প্রশান্তিতে নিদ্রা হয়ে যায়। অতঃপর শুরু হয় মুষলধারে বৃষ্টি। বৃষ্টি থামার পর আকাশে মেঘের গর্জন এবং বিজলি চমকানোর মধ্য দিয়ে তারা পরিষ্কার দেখতে পান মড়িটা যথাস্থানে পড়ে আছে। আকাশের ঘনঘটা এবং বিজলি চমকানো শেষ হলে আবার ঘোর অন্ধকারের মধ্যে পতিত হন তারা। চিত্ত বাবু ধরেই নিয়েছেন যে তাদের উপস্থিতি হয়তোবা বাঘটা টের পেয়ে গেছে, তাই ওটার মড়িতে আসার আর কোন সম্ভাবনা নেই।

এর মধ্যে হঠাৎ রাত দু'টার দিকে তাদের বাম পার্শ্বে জঙ্গলের মধ্যে কোন একটা জন্তুর নড়াচড়ার শব্দ শোনা যায় এবং ধীর গতিতে ওটা মড়ির দিকে এগুচ্ছে বলে মনে হয়। সাথে সাথে মাচার ওপর দু'জনই সতর্ক হয়ে যান। কিন্তু রহমত মিঞা যথেষ্ট অভিজ্ঞ শিকারি ছিলেন না, এ ক্ষেত্রে যা হবার তাই হলো। তার শরীরের কম্পন মাচাটাকে মৃদু দোলা দিতে থাকে। জন্তুটার আগমনের গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করে চিত্ত বাবু উপলব্ধি করলেন যে এটা বাঘ নয়। তবুও সঙ্গীর এহেন কাঁপুনি এবং তাড়াহুড়া দেখে নিজেই গুলি করার জন্য উদ্যত হলেন, কারণ কম্পমান অবস্থায় তার নিশানা নিঃসন্দেহে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে।

শিকার জীবনে চিত্ত বাবু হাজার হাজার বন্য প্রাণীর সম্মুখীন হয়েছেন, কিন্তু কোনদিন অকারণে কোন প্রাণী হত্যা করেননি। এমনকি শত শত গাভীন হরিণও নিরাপদে ওনার সামনে থেকে চলে গেছে। আজ কিন্তু সঙ্গীর এ অবস্থার জন্য প্রাণীটিকে নিজে গুলি করতে প্রস্তুত হয়ে যান। হান্টিং টর্চ জ্বালাতেই দেখেন একটা বৃহৎ আকারের ভালুক। ডান কাঁধ নিশানা করে শর্ট গানের গুলি করার সাথে সাথেই বিকট শব্দ করে লাফাতে লাফাতে ভালুকটা পার্শ্বের জঙ্গলে চলে যায়। মনে হচ্ছিল ভালুকটা এ বলে তীব্র প্রতিবাদ করছিল যে, "আমি এ মহিষের বাচ্চা মারিনি, আমি মৃত কিছু খাইও না, শুধু বাঘ কিভাবে এটা মেরেছিল তাই দেখতে এসেছি, তবে আমার উপর কেন এ গুলিবর্ষণ। মানব জাতির এ কি অবিচার!" কিছুক্ষণ লাফালাফির পর ভালুকটি আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে যায়। গুলির শব্দের পর বাঘ আসার আর কোন সম্ভাবনাই রইলো না। পরদিন পাহাড়ি মগরা খাওয়ার জন্য সানন্দে নিয়ে যায় ভালুকটা। এরপর চিত্ত বাবু চেঙ্গিতে এক দিন বিশ্রাম নিয়ে নিজ গ্রামে ফিরে আসেন।

সপ্তাহ দুই পর আবার ওনার কাছে খবর এল যে পার্শ্ববর্তী মরাচেঙ্গি এবং সাবেক কং এলাকায় বাঘটার উপদ্রপ আরও তীব্রতর হয়ে গেছে। বাঘটি ঐ সব এলাকায় রীতিমত ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। ইতোমধ্যে ঐ এলাকার ৫-৬টি গরু মহিষ মেরে ফেলেছে। বাঘটির অদ্ভুত এক স্বভাবের কথা তারা বলল, শিকার মারার পর যে পর্যন্ত ভক্ষণ করা সম্ভব তা সেরে ফেলে আর মড়ির ধারে কাছেও আসে না। তাই কারো পক্ষে বাঘটির পিছু নিয়ে খোঁজ পাওয়া সম্ভব ছিল না। খবর পেয়েই কয়েকজন অনুচর ও শিকারিসঙ্গীসহ যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়ে চিত্তবাবু রওয়ানা হয়ে গেলেন। সাবেক কং এলাকায় পৌঁছেই একটি বলদ কিনে নিলেন টোপ হিসেবে ব্যবহার করার জন্য। বাঘটির আনাগোনা কিছুদিন ধরে যে দিকটায় বেশি ছিল সে এলাকায় একটি খামার বাড়িতে লোকজনসহ থাকার ব্যবস্থা নেন। তার শিকারি সঙ্গীদের মধ্যে পুলিশ ফাঁড়ির একজন কনস্টেবলও ছিলেন। রাত ৮টার মধ্যেই খাওয়াদাওয়া শেষ করে তারা পাহারা দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। এর মধ্যে খামার বাড়ির প্রায় ১০০ গজ ব্যবধানে গরুটি খুব শক্ত করে একটি গাছের সাথে বেঁধে দেয়া হয়। আগে থেকেই খামারবাড়ি এবং গরুটির মধ্যবর্তী স্থানে একটি ঢিবির পার্শ্বে ছোট একটা নালার নিকট বসার স্থান নির্ধারণ করেছিলেন। স্থানটি গরু থেকে ৩০ গজের মত দূরত্বে ছিল। তথায় চিত্তবাবু তিন জন শিকারিসহ পাহারা দেয়ার জন্য বসে পড়েন। তাদের ধারণা ছিল বাঘ গরুটিকে আক্রমণ করলে বসা অবস্থায় এ জায়গা থেকে সহজেই গুলি করা যাবে।

তিন জন শিকারি তিন দিকে মুখ করে বন্দুক হাতে ওতপেতে বসে আছেন। এ অবস্থায় তাদের শুরু হয় অপেক্ষার পালা। দু-তিন ঘণ্টা অতিবাহিত হয়ে গেল,

এর মধ্যে তেমন কোন কিছুই ঘটলো না। রাত বারটার দিকে হঠাৎ করে গরুটি শব্দ করে উঠলো। পরক্ষণেই ফর ফর করে কিছু ছেঁড়ার শব্দ পাওয়া গেল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই আবার চারিদিক নিঃশব্দ হয়ে গেল। নিমিষের মধ্যে ঘটনাটি ঘটে যায়। প্রায় মিনিট দু'য়েক পর হান্টিং টর্চ জ্বালিয়ে দেখা গেল তাদের টোপ দেয়া প্রায় দু' মণ ওজনের গরুটির সামনের পা দু'টি রেখে বাকিটুকু মুরগির রোস্ট ছেঁড়ার মতো ছিঁড়ে নিয়ে গেছে। এর পাঁচ সাত মিনিট পর আরো একটু দূরে গরুটির ছিঁড়ে নিয়ে যাওয়া অংশটুকু খাওয়ার শব্দ পাওয়া যায়। গরুটির মাংস থেকে চামড়া টানার শব্দ শুনে মনে হচ্ছিল যেন রেঁদা দিয়ে কাঠ মিস্ত্রি কাঠ পালিশ করছে। হাড় চিবানোর সময় কনস্টেবল মন্তব্য করেন "দাদা মনে হচ্ছে যেন কাপ্তাই পেপার মিলে মেশিন দিয়ে বাঁশ গুঁড়ি করা হচ্ছে।" চিত্তবাবুর দু'জন সাথি তখনও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসেছিলেন। এ অবস্থায় চিত্তবাবু বাঘটির কাছে গিয়ে গুলি করার জন্য উদ্যত হয়েছিলেন, কিন্তু দু'জন সঙ্গীর প্রবল বাধা উপেক্ষা করতে পারলেন না। ঐ রাত্রে তাদের আর কিছুই করার ছিল না। অগত্যা আরও কয়েক ঘন্টা অপেক্ষা করে সবাই খামারবাড়িতে ফিরে আসেন।

পরদিন সকালে খামারবাড়ি হতে বের হয়ে ওখানটায় ভালমতো খুঁজতেই গরুটির অবশিষ্ট অংশ চিত্তবাবুর দৃষ্টিগোচর হয়। গরুটির ছিঁড়ে নিয়ে যাওয়া অংশ সাবাড় করে বাঘ দক্ষিণ দিকে গভীর অরণ্যের মধ্য দিয়ে চলে গেছে। একজন শিকারি সঙ্গীসহ ওনার ০.৪০৫ বোরের রাইফেলটি নিয়ে বাঘটির খোঁজে ঐদিকে চিত্তবাবু যাত্রা শুরু করেন। বিগত রাত্রে যে নালার পাড়ে তারা বসেছিলেন নালাটি এঁকেবেঁকে প্রায় আধ মাইল দক্ষিণে গিয়ে পূর্ব দিকে মোড় নিয়েছে। গহিন জঙ্গল পেরিয়ে দু'জনই নালাটির পাড়ে পৌঁছলেন। নালা দিয়ে যথেষ্ট পানি প্রবাহিত হচ্ছিল বলে বাঘটির পায়ের ছাপ দেখা যাবে কিনা সন্দেহের মধ্যে ছিলেন তারা। নালার মধ্যে তীক্ষ্ণ নজর রেখে পূর্ব দিকে কিছুদূর এগুতেই তারা একটা ঘন কাঁটাবনের ঝোপ দেখতে পান। ঝোপঝাড়ের মধ্যদিয়ে বৃহৎ একটি বাঘর হেঁটে যাওয়ার চিহ্নও তারা দেখতে পান। চিহ্ন অনুসরণ করে কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর জঙ্গলের মধ্যে তারা আর কিছুই অনুমান করতে পারলেন না। তবুও দু'জনে অনুমানের উপর ভিত্তি করে যেদিকে ঘন জঙ্গল সেদিকেই অগ্রসর হতে থাকলেন। পাহাড়ি এসব অঞ্চল খুবই ঘন জঙ্গলে ঢাকা। পুরা এলাকার বিভিন্ন স্থানে পাহাড়ি উপজাতীয়দের অনেক বসতিও আছে। প্রায় তিন-চার মাইল দুর্গম পাহাড়ি পথ পেরিয়ে বারটার দিকে তারা একটি চাকমা বসতির নিকট চলে আসেন। এলাকার কারবারিকে বাবুর আসার উদ্দেশ্য বলাতেই অত্যন্ত সমাদর করে বস্তিতে নিয়ে যান এবং একটি ঘরে থাকারও ব্যবস্থা করে দেন। জায়গাটিতে বিস্তর সমতল ভূমি ও নদীনালা আছে। ছোট ছোট ৫০-৬০টি ঘরবাড়ির এ বসতিটির নাম কইলার ডেরা। স্থানীয় লোকজন খুবই সরল, অভাবগ্রস্ত তবুও অতিথিপরায়ণ। রাত্রিবেলা গল্পের সময় কয়েকজন লোক জানাল কিছুদিন ধরে একটি বাঘের আনাগোনা

লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তবে গরু বা অন্য কোন প্রাণী বধ করতে পারেনি। চিত্তবাবুকে বাঘটি মারার জন্য কয়েকদিন ওখানে থাকার অনুরোধ করলে তিনি সানন্দে তাদের প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান। সাবেক কং এর খামারবাড়ি হতেও সঙ্গীদের যারা এখানে আসতে চান তাদের আসতে খবর দেয়া হয়। গ্রাম্য লোকদের সাথে গল্পগুজবের মধ্য দিয়ে চিত্তবাবু জানতে পারলেন যে ওখান থেকে তিন-চার মাইল পূর্ব দিকে কানুর ডেরা নামক একটি স্থানে যথেষ্ট শিকার আছে। ঐ সব শিকারের লোভে অনেক বাঘও ঐ স্থান ছেড়ে যেতে চায় না। পরদিন ঐ স্থানের উদ্দেশ্যে সকাল ১০টার দিকে যাত্রা করলেন। রনজু নামের একজন স্থানীয় গাইডকেও সাথে নিলেন।

স্থানীয় জনগণের বক্তব্য যে আসলেই সত্য তা তিনি জায়গায় পৌছার সাথে সাথে অনুধাবন করলেন। পাহাড়ি বিশেষ ধরনের গাছ, যেমন--হরীতকী, আমলকী ইত্যাদির ফল হরিণের খুব পছন্দের খাবার। এ স্থানে অসংখ্য এজাতীয় গাছ আছে। কানুর ডেরা পৌছে জঙ্গলের মধ্যে কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করে পছন্দনীয় একটি স্থানে কয়েকটি আমলকী গাছ সামনে রেখে তারা বসে পড়েন। জঙ্গলের অভ্যন্তরে একটি ছাতিম গাছে হেলান দিয়ে তারা হরিণের অপেক্ষায় ওতপেতে থাকেন। কিছুক্ষণ পর পিছনে হনুমানের ডাক শুনেই উৎফুল্ল চিত্তে তিনি রনজুকে বললেন, হয়তো কিছু একটা আশেপাশে আছে। অল্পক্ষণ পরই বিরাট একটা চিতাবাঘ পিছন থেকে এসে তাদের নিকটবর্তী বনলতার ঝোপের অপর পার্শ্বে মাথাটা বের করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ছাতিম গাছটির জন্য তাদেরকে বাঘটি দেখতে পায়নি। বাঘটির শরীর তাদের থেকে মাত্র দু-তিন হাত ব্যবধানে ছিল। এ অবস্থায় রাইফেল তাক করা দূরের কথা জোরে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেয়াও বোধ হয় বাঘটা বুঝতে পারতো। নিরুপায় হয়ে রাইফেলের ফাঁকা আওয়াজ করে তিনি নিজেদের বিপদমুক্ত করলেন। ঐ দিন রাত্রেই তারা খামারবাড়ির বস্তিতে ফিরে আসেন।

যতদিন পর্যন্ত বাঘটির কোন খবর পাওয়া না যায় ততদিন পর্যন্ত চিত্তবাবু কইলার ডেরাতে অবস্থান করবেন এবং এ স্থানটিকে কেন্দ্র করে শিকার পরিকল্পনা করবেন বলে মনস্থ করলেন। কয়েকদিন পর পুনরায় কানুর ডেরাতে ভোরবেলা শিকারের উদ্দেশ্যে রাত দু'টার দিকে কয়েকজন সঙ্গীসহ যাত্রা করেন। কিছুদূর পাহাড়ি পথ চলার পর একটি পাহাড়ি ঝর্ণার মধ্যদিয়ে চার-পাঁচ জনের এ দলটি জোৎস্নার আলোতে ধীর গতিতে হাঁটছিল। ঝর্ণার মধ্যে অল্প অল্প স্বচ্ছ নির্মল পানির স্রোত উজান হতে প্রবাহিত হচ্ছিল। দলের অগ্রবর্তী একজনের হাতে দা ও অন্যজনের হাতে শর্টগান, সাথে রনজু ও তার শিকারি কুকুরটিও ছিল। কুকুরটি সাথে নেয়ার উদ্দেশ্য ছিল শুধু প্রয়োজন হলে হরিণ অথবা এধরনের অন্য কোন শিকার তাড়া করা। চিত্তবাবুর নিজেরও শিকারি কুকুর আছে, তবে তিনি

সাধারণত এটিকে জঙ্গলে নেয়া পছন্দ করেন না। শিকারি কুকুরের অভ্যাস জঙ্গলের মধ্যে চলার সময় প্রভুর থেকে অগ্রগামী হয়ে চলা। কিন্তু এমন কোন বিপদের আভাস পেলে যা তার পক্ষে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়, তখন সে প্রভুর কাছে এসে লেজ গুটিয়ে থাকতে চায়।

ঝরণার মধ্যে শিকারি দলটি বেশ কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর কুকুরটি লোকজনের কাছে এসে লেজ গুটিয়ে এক অদ্ভুত আচরণ করতে লাগলো। কুকুরটির অবস্থা দেখেই চিত্তবাবু বিপদ অনুমান করে সবাইকে সতর্ক করে দিলেন। আর একটু এগুতেই সম্মুখে পানির মধ্যে মৃদু নড়াচড়ার শব্দ পাওয়া যেতে থাকে, ফলে সবাই আরো সাবধান হয়ে যায়। এদিকটায় হাতির তেমন কোন উৎপাত নেই, তাই অন্য কোন প্রাণী মনে করে মন্থর গতিতে শিকারি দলটি সম্মুখের দিকে চলতে লাগলো। গহিন জঙ্গলের মধ্যে ৭-৮ ফুট চওড়া নালাটিতে টর্চের আলোতে প্রবাহিত ঘোলা পানি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। এভাবে সামান্য কিছুদূর এগুবার পর সামনের বাঁক পার হবার পূর্বেই কিছু একটা প্রাণীর চলার শব্দ শুনতে পেল শিকারি দলটি। তড়িৎ গতিতে শর্টগানটি নিয়ে সবার সম্মুখে এগিয়ে গেলেন চিত্তবাবু।

বাঁকটি পার হতেই দেখলো বৃহৎ একট সাপ পানির মধ্যদিয়ে ধীর গতিতে সামনের দিকে এগুচ্ছে। অজগর সাঁপ মনে করে শিকারি দলটি নালার উপরে উঠে সামনের দিক থেকে সাপটিকে ঘিরে ফেলল। এমন সময় সাপটির মাঝামাঝি স্থান লক্ষ্য করে গুলি করলেন দলের আর একজন। গুলিবিদ্ধ হয়ে সাঁপটি নালার অপরদিকের খাড়া পাহাড়ে উঠার চেষ্টা করছিল, তখন মাথার একটু পার্শ্বে গুলি করে সেটিকে ধরাশায়ী করলেন চিত্তবাবু। কাছে গিয়ে দেখা গেল ওটা অজগর সাপ নয়, ভয়ঙ্কর একটি কালনাগিনী। কিছুক্ষণ পূর্বে উদর ভর্তি কিছু একটা ভক্ষণ করে বেচারির এ দশা হয়েছে। তা না হলে তার সামনে থেকে শিকারি দলের জ্যান্ত অক্ষত অবস্থায় ফেরা দুরূহ ব্যাপার ছিল।

ভোরবেলা বহেরা বাগান থেকে একটি ছোট হরিণ মারল শিকারি দল। সেটা দিয়ে তাদের দুপুরের ভোজন পর্ব শেষ করে বিকালবেলা পাহাড়ি খোলা জায়গায় (জুম এলাকায়) শিকার করে রাত্রে প্রত্যাবর্তন করবেন বলে তারা ঠিক করলেন। এর ফাঁকে আর একবার শিকার করার জন্য তারা আবার রওনা হলেন। পড়ন্ত বিকেলে জুমে ঘাসে আবৃত একটি পরিত্যক্ত শর্টগান নিয়ে চিত্তবাবু হরিণের অপেক্ষায় এক জায়গায় অবস্থান নেন। ঘণ্টা খানেক অপেক্ষার পর প্রায় চারশ গজ দূরে জঙ্গল থেকে একটি হরিণ নামতে দেখলেন। চিত্রা হরিণটি খোলা জায়গায় এসেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে চারিদিকে একবার চেয়ে নিল। অতঃপর খুব সাবধানে কোমল লতা এবং ঘাসের ডগা একটু একটু করে খেতে লাগল। সামনের দিকে

খুব ধীরগতিতে এগুতে লাগল হরিণটি। যে কোন কিছুর অগোচরে যেন যতদূর সম্ভব লতাপাতা খেয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে যাওয়াটাই তার জন্য নিরাপদ।

হরিণটার সামনের দিকে এগুবার গতি এত মন্থর ছিল যে চিত্তবাবুর বন্দুকের রেঞ্জের মধ্যে বেলা ডোবার আগে পৌছবে কিনা সন্দেহ। তাই হামাগুড়ি দিয়ে বন্দুক হাতে সামনের দিকে এগুতে চেষ্টা করলেন তিনি। প্রায় ৪০ গজ পর্যন্ত এগুবার পর একটি ঢিবির আড়ালে অবস্থান নিলেন। একটি কাঁটাঝোপ দেখলেন আরও ৫০ থেকে ৬০ গজ সামনে। অনুমান করলেন যদি লুকিয়ে লুকিয়ে ওটার দিকে যাওয়া যায় এবং ওদিক থেকে হরিণটা সামনে আসতে থাকে, তখন হয়ত বন্দুকের রেঞ্জের মধ্যে চলে আসবে হরিণটা। সাবধানে হামাগুড়ি দিয়ে অগ্রসর হতে লাগলেন হরিণটার ঘাস খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে।

ঝোপটা সামনে রেখে আরও একটু সম্মুখে অগ্রসর হতেই একেবারে হতভম্ব হয়ে পড়লেন তিনি। তার বাম পাশে একেবারে মাটিতে সমস্ত শরীর মিলিয়ে আর একজন হরিণটার দিকে এগুচ্ছে কাঁটালতার ঝোপের মধ্য দিয়ে। এখনও সে চিত্তবাবু থেকে ৪০ গজ দূরে আছে। সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে খুবই সতর্কতার সাথে বসে পড়লেন আর ভাবতে লাগলেন নিজের দলের কেউ না তো। ওটার আরও কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তাকে দেখেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন তিনি। বড় একটি চিতা বাঘ সাবধানে এগুচ্ছে হরিণটার দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে। এখনও চিত্তবাবুর থেকে প্রায় ৪০ গজ ব্যবধানে আছে। আর একটু অগ্রসর হলেই তাকে দেখে ফেলবে। এখান থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায় কি ভাবতে লাগলেন। তিনি বহু চিতাবাঘ শিকার করেছেন। প্রতিবার চিতা শিকারের সময় অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন তিনি। কারণ তিনি ভালভাবেই জানেন যে চিতাবাঘ বড় বাঘের চেয়ে রেগে গেলে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর। চিতার গর্জনও বাঘের গর্জনের চেয়ে ভয়ানক। ধূর্তামি ও প্রতিহিংসায় বাঘের চেয়ে একধাপ এগিয়ে চিতাবাঘ।

দোনালা বন্দুকের একটিতে লংরেঞ্জ এল জি অন্যটিতে বুলেট ভর্তি আছে। তাই নিয়ে একটি বড় চিতার সাথে সম্মুখ লড়াইয়ের জন্য তিনি প্রস্তুত হয়ে গেলেন। দক্ষতার অতিরিক্ত সাহস তিনি শিকার জীবনে দেখাননি কোনদিন। কিন্তু অনন্যোপায় হলে যে-কোন পরিস্থিতির জন্য তৈরি হতে হয়। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। আর কিছুদূর এগুবার পর মানুষ দেখে চিতাটাও কিছুক্ষণ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। সাথে সাথে হয়ত বা তার হরিণ ধরার পরিকল্পনা ভেস্তে যাওয়ার জন্য ঘৃণা এবং আক্রোশে ফুঁপিয়ে উঠতে থাকে। বাঘটা বন্দুকের রেঞ্জের মধ্যে আছে। পরক্ষণেই যথারীতি আক্রমণ করার জন্য উদ্যত হয় এবং মাটিতে লেজের

বাড়ি দিতে থাকে। মুহূর্ত দেরি না করে গুলি করেন চিত্তবাবু। এল জি এর আঘাতে বাঘটি আহত হয়ে গেল বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরও একটু অগ্রসর হয়ে লাফ দিল বাবুকে লক্ষ্য করে। বেসামাল অবস্থায় টার্গেটে পৌঁছতে পারল না চিতাটা, আবার উঠে আক্রমণ করার আগেই বুলেটের দ্বিতীয় গুলিতে সম্পূর্ণ ধরাশায়ী করলেন বৃহৎ এ চিতা বাঘটিকে।

বাঘ নিয়ে খামার বাড়িতে এসে দেখলেন মরাচেঙ্গির থেকে দুজন লোক এসে উনার জন্য অপেক্ষা করছে। তারা উনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছে, সেই বহুল আলোচিত বাঘটির তাজা খবর নিয়ে। তারা আরও জানায় মরাচেঙ্গি থেকে সাত আট মাইল দূরবর্তী এলাকায় পাহাড়ি অঞ্চলে বাঘটির দৌরাত্ম্য এত বেশি বেড়ে গেছে যে রীতিমত পাহারা না দিয়ে রাখতে পারছে না তাদের গরু-মহিষ। কয়েকদিনের মধ্যে বেশ কয়েকটি গরু-মহিষ ওটার খাবারে পরিণত হয়েছে। চিত্তবাবু পরের দিনই মরাচেঙ্গি হয়ে উপদ্রুত এলাকার উদ্দেশ্যে রওনা হন, সাথে ২ জন শিকারি সঙ্গীও নেন। পাহাড়ি চড়াই-উতরাই ও পাথুরে টিলা পার হয়ে বেলা তিনটা নাগাদ পৌঁছে গেলেন ছোট একটি পাহাড়ি গ্রামে। গ্রামে ৭০-৮০টি বাড়ি আছে। অধিকাংশ লোকই খেটে খাওয়া দিনমজুর। কিছু কিছু লোকের আবার গরু-মহিষও আছে।

কাছাকাছি জঙ্গলবাড়ি নামক একটি স্থানে চিত্তবাবুর জন্য লোকজন নিয়ে থাকার ব্যবস্থা করা হল। রাত্রে বসে এলাকার লোকজনের মুখে কিভাবে বাঘটি গরু মহিষ ধরে নিয়ে গেছে এসব গল্প শুনতেন আর দিনের বেলা শিকার করে কাটাতেন। বিভিন্ন কাহিনী থেকে তিনি ঠিকই অনুধাবন করে নিয়েছিলেন যে, বাঘটির ঐ একই স্বভাব রয়ে গেছে অর্থাৎ শিকার ধরার পর প্রথমবারে যতদূর সম্ভব খেয়ে চলে যায় এরপর মড়ির ত্রিসীমানায়ও আসে না। হয়ত মানুষকে এড়িয়ে চলার অতিরিক্ত চালাকির কারণে প্রায় পঞ্চাশ ষাটটির মত গরু-মহিষ বধ করলেও ওটার কেউ কোন ক্ষতি করতে পারেনি।

স্থানটি কয়েকটি উঁচু পাহাড়ের পাদদেশে একটি মালভূমি। এর পূর্ব প্রান্তে একটি প্রাকৃতিক লেকের মত আছে যার একপ্রান্ত পাহাড়ি একটি নদীর সাথে সংযুক্ত। লেকটার পশ্চিম পাড়ে কয়েকটি খামারবাড়ি আছে, যেখানে ধান চাষের মৌসুমে কৃষকরা বসবাস করে খাসজমি চাষাবাদের জন্য। যেখানে বাঘের যাতায়াতের পদচিহ্ন বেশি দেখা যায় সে রকম দুটি সম্ভাবনাময় স্থানে মাচা তৈরি করার ব্যবস্থা করলেন। দুটি মাচা প্রায় আধা মাইলেরও বেশি ব্যবধানের মধ্যে তৈরি করা হলো। ঐ রাত্রে একটিতে একজন সঙ্গীসহ তিনি বসলেন এবং অপরটিতে পুলিশের সিপাহী সালাম মিঞা কালু নামের একজন স্থানীয় লোক নিয়ে বসলেন। উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটল না চিত্তবাবুর মাচার সামনে। সালাম

মিঞার মাচার সামনের মহিষের বাচ্চাটি এক অদ্ভুত কায়দায় বধ করল বাঘটি। রাত বারটার দিকে ঝোপঝাড়ের ভেতর থেকে বৃহৎ আকারের বাঘটি বের হয়ে দূর থেকে অপলক দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। সেদিন রাত নয়টার দিকে চাঁদ উদয় হয়েছিল। রাত বাড়ার সাথে সাথে আকাশের বুক থেকে সবুজ বনানীতে রূপালি ঝর্ণার মত ঝরে পড়ছিল চাঁদের আলো। বাঘটিকে আরও ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছিল চাঁদের আলোতে।

সালাম মিঞা বাঘটির দিকে বন্দুক তাক করতে যাচ্ছিল এমন সময় তার সঙ্গী কালু তার দু'হাত জড়িয়ে ধরে বলতে থাকে "মামারে গুলি করলেই ওটা আমাদেরকে খেয়ে ফেলবে"। এরই এক ফাঁকে চোখের পলকের মধ্যেই বাঘটি সামনে রাখা মহিষের বাচ্চাটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘাড় ভেঙ্গে দেয়। অতঃপর মহিষের বাচ্চাটিকে বাঘ তার সামনের দু'পায়ে জড়িয়ে ধরে সজোরে এক টান দেয়। শক্ত বাঁশের রশি দিয়ে গাছের সাথে বাঁধা মহিষটির রশি ছিঁড়ে গিয়ে প্রায় আট ফুট উপরে একটি গাছের ডালের সাথে মহিষের একটি পা আটকে যায়। কত শক্তি থাকলে দেড় মণ ওজনের একটি মহিষের বাচ্চা টান দিয়ে ৮ ফুট উপরে তুলতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। পরক্ষণে মহিষটির একটি পায়ের কিছু অংশ ছিঁড়ে নিয়ে জঙ্গলের ভিতর উধাও হয়ে যায় বাঘটি। কালু তখনও সালাম মিঞাকে জড়িয়েছিল। এর মধ্যে হাত ছাড়িয়ে গুলি করেছিল বটে কিন্তু ততক্ষণে বাঘটি বন্দুকের রেঞ্জের থেকে দূরে চলে যায়। পরদিন ভোরে চিত্তবাবু ঐ স্থানে আসার পর কালু উনাকে বলল "দাদা এটা বাঘ নয় একটা দৈত্য, আপনি বৃথা এটার পিছু নেবেন না"।

ইতোমধ্যে আরও কয়েকটি স্থানে বসে বাবু বিফল হলেন বটে কিন্তু তিনি ক্ষান্ত হলেন না। কারণ তিনি হাল ছাড়ার লোক নন। ইতোমধ্যে একদিন এক গহিন জঙ্গলে একটি মাচা তৈয়ার করে স্থানীয় একজন শিকারিসহ বাঘটির জন্য পাহারায় বসেন। মাচাটির তিন দিক গহিন জঙ্গল শুধু সামনের দিকটা খালি ছিল, সেখানে একটি মহিষের বাচ্চা বেঁধে দেয়া হয়। বেলা ডোবার আগে তারা মাচায় বসে যান। সূর্য পশ্চিম আকাশে আবির ছড়িয়ে ডুবে যাওয়ার পরক্ষণে রাতের ম্লান অন্ধকার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এর ঘণ্টা খানেক পর দক্ষিণের জঙ্গল থেকে বিকট হুঙ্কার দিয়ে ওঠে বাঘটি। প্রায় পনের মিনিট পর মাচার নিচ দিয়ে গিয়ে মাচার উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আবারও গর্জন শুরু করে। রক্ত হিম করা সে গর্জন। এরকম তিন চার বার হুঙ্কার দেয়ার পর এক সময় ক্ষান্ত হয়ে যায় বাঘটি। এ অবস্থায় চিত্ত বাবুর কিছুই করার ছিল না। কারণ হান্টিং টর্চ দিয়েও দেখা যেত না বাঘটাকে এবং ওটার অবস্থানও বন্দুকের রেঞ্জের থেকে দূরে ছিল। আবার মাচার মধ্যে ক্লান্তিকর একটি রাত কাটিয়ে সকালে দুজন মহিষের বাচ্চাটি নিয়ে

খামারবাড়ির দিকে চলে আসেন। পথিমধ্যেই কয়েকজন লোকের দেখা হয় যারা পার্শ্ববর্তী একটি লোকালয় হতে চিত্তবাবুকে খবর দেয়ার জন্য আসছিল। তারা বলল, তাদের গোশালা হতে একটি দুধেল গরু গত রাত্রে আনুমানিক ৩টার দিকে বাঘে ধরে নিয়ে গেছে; এ খবর দেওয়ার জন্য তারা বাবুর কাছে আসছিল। চিত্তবাবু যথাস্থানে পৌঁছে দেখলেন মড়িটা প্রায় শেষ করে ফেলেছে বাঘটি। বাঘটির স্বভাব সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন বলে মড়িতে বৃথা পাহারা দেয়ার আর চেষ্টা করলেন না।

বাবুর এরূপ নিষ্ফল চেষ্টা এবং বাঘটির বর্ধিত দৌরাত্ম্য দেখে এলাকার কয়েকজন মোড়ল এবং বৃদ্ধগোছের লোকজন বাঘটি মারার জন্য "বাঘমারা কল" বসাবার প্রস্তাব দিলেন চিত্তবাবুকে। বাঘমারা কলটি এরকম যে টোপ হিসেবে যে গরু বা মহিষ ব্যবহার করা হবে ওটার চতুর্পার্শ্বে রশি থাকবে। রশিতে বাঘের শরীর লাগার সাথে সাথে উপর থেকে একটি খুব ভারি কাঠ বাঘের শরীরের উপর পড়বে। কাটের সাথে লাগানো ধারালো খটি বাঘটিকে দ্বিখণ্ডিত বা গভীরভাবে কেটে ফেলবে। প্রথমে যদিও উনি এরূপ ব্যবস্থার উপর আপত্তি জানিয়েছিলেন; পরে অবশ্য নিজের ব্যর্থতা এবং অঞ্চলের জনগণের এতগুলো পশু নষ্ট হওয়ার কথা চিন্তা করে আপত্তি জানাননি। কয়েকদিন পরই লোকজন জঙ্গলের মধ্যে এ রকম ফাঁদ পাততে শুরু করে।

এর মধ্যে পার্শ্ববর্তী নদীর ভাটিতে গভীর জঙ্গলে জীবজন্তুর চলাচলের একটি স্থান কিছু দিন আগে চিত্তবাবুর দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। সেস্থানেই মহিষের বাচ্চার টোপ দিয়ে শক্ত করে একটি জুতসই মাচা বানিয়ে বাবু আর একবার চেষ্টা করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তদনুয়ায়ী ঐ রাত্রেই ওখানে মাচা তৈয়ার করে বসে যান। সূর্য ডোবার আগে ঘন্টা খানেকের মধ্যে কিছু সজারু এবং শূকরের দল ছাড়া কিছুই চোখে পড়ল না উনার। সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বক্ষণের সময়টায় জঙ্গলের অভ্যন্তরের শোভা নিঃসন্দেহে দর্শনীয়। পাখির কোলাহলে মুখরিত এ সময়টায় মনে হয় এমন কোন পশুপাখি নাই যে তার সঙ্গীকে নিশি আগমনের সতর্ক সংকেত দেয় না। অস্তগামী সূর্যের আলোর প্রতিফলনে পাহাড়, বন, জঙ্গল এবং পানি অপরূপ লাবণ্যমণ্ডিত শ্যামল রূপ ধারণ করে। বাবু একাগ্রচিত্তে এসব দৃশ্য অবলোকন করছিলেন। তার সামনে বাঁধা মহিষের বাচ্চাটি তখনও নির্বিঘ্নে তার জন্য দেওয়া ঘাস চিবিয়ে খাচ্ছিল। হয় ত এই আশা নিয়ে যে, তার দোসর মানব গোষ্ঠীর লোক যারা তার সামনে গাছের উপর আছে তারা কি তাকে রাত্রি বেলা অরণ্যে ছেড়ে যেতে পারেন?

মাচা হতে ঝোপঝাড়ের উপর দিয়ে অনেক দূর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অস্তগামী সূর্যের আলো গাছের উপরিভাগে এখনও প্রতিফলিত হচ্ছে। এ অবস্থায় হঠাৎ

ভেতর হতে বেরিয়ে আসে একজোড়া ডোরাকাটা বাঘ। তবে বন্দুকের রেঞ্জের থেকে দূরে। এগুলো যেহেতু কাঙ্ক্ষিত বাঘ নয়, তাই এগুলোকে গুলি করার প্রশ্নই ওঠে না। হলুদ রঙের এ রাজকীয় প্রাণী দুটির দিকে বিমুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে তিনি ভাবতে লাগলেন জঙ্গলের অতুলনীয় সুন্দর জন্তু এবং বর্ণনাতীত শোভার অধিকারী কেন যে এত ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে? হলুদ রঙের বাঘ রাজকীয় ভঙ্গিতে যখন জঙ্গলের মধ্যে হেলিয়ে দুলিয়ে চলতে থাকে এ অপরূপ দৃশ্য ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। এর কিছু ইঙ্গিত কর্বেট এবং এনভার্সনের মত শিকারিরাও তাদের বইতে দিয়েছেন। অন্ধকারে আচ্ছন্ন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যতক্ষণ দেখা গেল বিমুগ্ধ হয়ে বাঘ দুটির দিকে তাকিয়ে থাকেন চিত্তবাবু। এদিকে উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটল না। কিন্তু ঘণ্টা খানেক পর পাশের গহিন জঙ্গল হতে একটি বাঘ ভয়ঙ্করভাবে গর্জাতে শুরু করল। বুঝাই যাচ্ছিল যে এটি সেই কাঙ্ক্ষিত বাঘটির কাণ্ড। বাঘটি বাবুর অবস্থান দেখে ফেলেছে। কিছুক্ষণ পর সেটিও নিস্তব্ধ হয়ে যায়।

সারারাত আর কিছু ঘটেনি। মহিষটিও কিছুক্ষণ ঘাস চিবানোর পর ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। ভোর হওয়ার সাথে সাথে উৎফুল্ল জনতার একটি দল বাঘটির ফাঁদে পড়ার খবর দিতে এবং বাবুকে নিয়ে যেতে মাচার ওখানে আসে। তিনি ফাঁদ পাতার স্থানে গিয়ে দেখলেন বৃহৎ আকারের বাঘটি প্রায় দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় পড়ে আছে এবং বাঘটির উৎপাতও ঐ এলাকায় চিরদিনের জন্য নিঃশেষ হয়ে যায়।

[২০০০ সালে বাবু চিত্ত রঞ্জন নাগ কর্তৃক বর্ণিত এ শিকার কাহিনী। এ কাহিনী বর্ণনার সময় তিনি আক্ষেপ করে বলছিলেন, এ দেশে জঙ্গলের সে যুগ কি আর ফিরবে না? জঙ্গলের সৌন্দর্য কি অপূর্ণই থেকে যাবে? ইদানীং গাছপালা ও বন জঙ্গল উজাড় হওয়ার দরুন জঙ্গলের জীবজন্তু বিপন্ন হওয়াতে তাকে যেভাবে বেদনা দিচ্ছে তা উনার বর্ণনার ভঙ্গিমা হতে উপলব্ধি করা যাচ্ছিল।]

আহত এক রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মুখোমুখি

পঞ্চাশ দশকের প্রথম দিকে দেশে শিকার যখন নিষিদ্ধ ছিল না সে সময়ে চট্টগ্রাম জেলার দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত চুনতি গ্রামের লোমহর্ষক একটি শিকার ঘটনার বর্ণনা দেয়া হয়েছে এ শিকার কাহিনীতে। শিকার যখন নিষিদ্ধ ছিল না এবং বিপুল পরিমাণে বন্যপ্রাণী চট্টগ্রাম অঞ্চলের জঙ্গলে পাওয়া যেত, তখন দেশে বিনোদনমূলক শিকার অনেকের এক ঐতিহ্যবাহী নেশায় পরিণত হয়েছিল। আবহমান কাল হতে বিপদসংকুল, রোমাঞ্চকর এবং ঝুঁকিপূর্ণ এ বিনোদন বা ক্রীড়ার প্রতি অনেকে অজান্তেই আকৃষ্ট হয়ে পড়ত। অনেকে আবার বন্যপ্রাণী হতে ক্ষেতখামার রক্ষার্থে, অনেক সময় নিজেদের আত্মরক্ষা করতে গিয়ে শিকারের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যেত। সে যা হোক, নিষিদ্ধ না থাকার কারণে তখন শিকার করা কোন ভাবেই গর্হিত কাজ বলা যাবে না।

তবে বর্তমানে বনজঙ্গল উজাড় হওয়ার দরুন বন্যপ্রাণী বিপন্ন হওয়ার প্রেক্ষিতে সর্বোপরি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে কিছু কালের জন্য বাংলাদেশে সম্পূর্ণভাবে শিকার নিষিদ্ধ করার যে যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়েছে তাকে সৌখিন শিকারিগণ সর্বতোভাবে সাধুবাদ জানিয়েছেন। কেননা ইদানীং বন্যপ্রাণী নিশ্চিহ্ন হওয়ার কারণে তাদের শিকারের নেশা এমনিতেই ম্লান হয়ে গেছে। গাছপালা উজাড় হয়ে গেলে পাখিকুল এবং জলাশয় শুকিয়ে গেলে মাছ ও সরীসৃপ যেভাবে অসহায় হয়ে পড়ে, তদ্রূপ বনের শিকার বিলুপ্ত ও ধ্বংস হলে সবচাইতে বেশি মর্মাহত ও নিরুপায় হয়ে পড়ে শিকারিসম্প্রদায়। স্বভাবতই ক্ষতিগ্রস্তদের থেকেই যে কোন ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী চিন্তাধারার বিকাশ পায়। শিকারের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি চট্টগ্রাম অঞ্চলে। পরিবেশ এবং জঙ্গলের জীবজন্তু সংরক্ষণের দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে অভয়ারণ্যের উদ্ভাবনী চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটেছিল এ অঞ্চলের কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ শিকারিদের মধ্যে। বই এর শেষ অনুচ্ছেদে এ বিষয়ে বর্ণনা আছে।

আসল ঘটনায় আসা যাক। আরকান রোড দিয়ে কক্সবাজার যাওয়ার পথে চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজারের মাঝামাঝি সমদূরবর্তী স্থানে যেখানে রাস্তাটি ছোট পাহাড়ের টিলার উপর উঠতে শুরু করেছে সে জায়গাতেই চুনতি গ্রামের অবস্থান। গ্রামটির ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিবেশ খুবই চমকপ্রদ। তিন দিক দিয়ে শুধু যে অরণ্যময় জঙ্গলে আবৃত তা নয়, এর পশ্চিম দিকে দো চালার পর্বতরাশি এবং পূর্বদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিস্তীর্ণ অরণ্য এলাকা অবস্থিত। তদানীন্তনকাল হতে

শিক্ষা এবং সংস্কৃতি বিকাশের জন্য চুনতি একটি অনন্য গ্রাম হিসেবে স্বীকৃত ছিল। পঞ্চাশ ও ষাট দশকের সরকারি সেন্সাসে তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তানের শিক্ষিত গ্রাম হিসেবে যথাক্রমে প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী ছিল এ গ্রামটি। চার থেকে পাঁচ দশক পূর্বে এ গ্রামের পাশ্ববর্তী জঙ্গলগুলোতে যেমন বন্যপ্রাণীর প্রাচুর্য ছিল, তদ্রূপ গ্রামেও নামি-দামি প্রথিতযশা চৌকস শিকারির অভাব ছিল না। জঙ্গলের অভ্যন্তরে যেমন বন্যপ্রাণীর খাদ্যাভাব ছিল না তেমন জঙ্গলও গহিন থাকার কারণে এগুলোর আশ্রয়স্থলও যথেষ্ট নিরাপদ ছিল। এ ছাড়া জঙ্গলের আশেপাশে অনেক চাষাবাদ যোগ্য জমিও ছিল।

ঐ সময়ে চুনতি গ্রামের এক-দেড় মাইলের মধ্যে চিতাবাঘ এবং আরও একটু দূরে গহিন জঙ্গলে রয়েল বেঙ্গল টাইগারও দেখা যেত। নানাবিধ কাজকর্মের জন্য যারা জঙ্গলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করত তারা এগুলোর সামনাসামনি হত। বাঘ কিন্তু তার স্বভাবজাত কারণে এদেরকে এড়িয়ে চলত। একথা সর্বজনবিদিত যে, যখন কোন বাঘ শিকার করে ক্ষুধা নিবারণ করতে অক্ষম হয় বা জঙ্গলে শিকারের অমিল হয়, তখন বাঘের বিপদসংকুল শিকার, যেমন–জনগণের গরু বাছুর অথবা বাঘের দৃষ্টিতে সব চাইতে ধীর গতিসম্পন্ন শিকার, যথা–মানুষ ইত্যাদি শিকার করতে বাধ্য হয়। পঞ্চাশ দশকের দিকে এরূপ একটি ঘটনা ঘটে চুনতি গ্রামের পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে।

১৯৫৫ সালের দিকে গ্রাম হতে দেড় মাইল দূরে ওহাইদ্যা ঘোনা নামক স্থানে একটি রয়েল বেঙ্গল টাইগার বেপরোয়াভাবে উপদ্রব শুরু করে দেয়। বাঘটি চুনতি গ্রামের নিকটবর্তী আরকান রোডের পশ্চিম পার্শ্বের বিস্তৃত পাহাড়ি অঞ্চলে কিছুদিন পর পর গরু হত্যা করে গহিন জঙ্গলে নিয়ে যায়। অর্ধভুক্ত গরুর নিকট মাচা তৈয়ার করে কয়েকবার রাত্রে পাহারা দেওয়া হয়, কিন্তু বাঘটি যেন টের পেয়ে যায় এবং মড়ির ধারেকাছেও আর ফিরে আসে না। বেশ কিছুদিন পর একটু দূরবর্তী বড়বিল নামক পাহাড়ি একস্থানে দিনেরবেলা রাখালের সামনে একটি বড় হালের বলদ হত্যা করে জঙ্গলের ভিতর টেনে নিয়ে যায় বাঘটি। এ ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে গরুর পাল দৌড়ে গ্রামের দিকে চলে আসে, রাখাল বেচারাও ভয় পেয়ে গ্রামে এসে লোকজনকে খবর দেয়। এক কান দু'কান হয়ে ঘটনা দ্রুত গ্রামময় ছড়িয়ে পড়ে।

চুনতি গ্রামের সে সময়ের চৌকস শিকারি, ব্রিটিশ সরকারের অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি মেজিস্ট্রেট জনাব কবিরুদ্দিন আহমদ খানের কাছে এ খবর পৌঁছে যায়। বাঘটিকে শিকার করার আশায় প্রথম দু'একবার মাচায় ওতপেতে বসে তিনি বিনিদ্র রজনী যাপন করেছিলেন। তাই বাঘটির অদ্ভুত স্বভাব সম্বন্ধেও উনার জানা ছিল। এবার তাঁর বাড়ির কাছাকাছি জঙ্গলে আবার গরু হত্যা করেছে বলে তাজা

খবর পাওয়ার পর বিলম্ব না করেই অকুস্থলে পৌছার জন্য তিনি যাত্রা শুরু করেন। বর্ণনা মতে নির্দিষ্টস্থানে জঙ্গলে একটু ভিতরে ঢুকতেই মড়ির সন্ধান পেয়ে যান তিনি। ততক্ষণে সূর্যাস্তের পর চারিদিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেছে। বন্দুকে ফিট করা টর্চ জ্বালাতেই উনার নজরে পড়ে প্রায় ৮০ গজ দূরে জঙ্গলের ভিতর জ্বলন্ত বাঘের চোখ। তিনি তখনই বসে বাঘের চোখ লক্ষ্য করে গুলি করেন। কোন শব্দ না করে বাঘটি পালিয়ে যায়।

৫০ বছরের শিকারের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ডেপুটি মেজিস্ট্রেট সাহেব ব্রিটিশ সরকারের একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন। সরকারি চাকরির দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তার কর্মস্থল ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে একজন লাইসেন্সধারী সৌখিন শিকারি হিসেবেও তিনি বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। শিকার তার বংশানুক্রমে অর্জিত ঐতিহ্যবাহী একটি নেশা। চুনতি গ্রামে সে যুগে যে কয়েকটি গোত্রের মধ্যে শিকারের প্রচলন ছিল তার মধ্যে চুনতির ডিপুটি বাড়ি, মোনসেফ বাড়ি, মৌলভী বাড়ি, শিকদার বাড়ি ইত্যাদি। ডেপুটি কবিরুদ্দিন আহমদ খান চুনতির ডিপুটি বাড়ির সন্তান। তার শিকারের গুরু ছিলেন চুনতির প্রসিদ্ধ শাহ সাহেব মরহুম হাফিজ আহমদ সাহেব (বর্তমান ছিরতুন্নবি (ছঃ) এর প্রতিষ্ঠাতা শাহ সাহেব) এর পিতা জনাব সৈয়দ হাজি সাহেব।

ঐ সময়ে ডেপুটি সাহেবসহ এ গ্রামের অন্যান্য নাম করা যে কয়েকজন শিকারি ছিলেন তাদের প্রায় সকলের শিকারের হাতেখড়ি হয়েছিল হাজি সাহেবের হাতে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কবিরুদ্দিন আহমদ খানের ছোট ভাই কামাল উদ্দিন আহমদ খান (বাংলাদেশের স্বনামধন্য কবি সুফিয়া কামালের স্বামী), তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জনাব ইস্রাইল খান, এ গোত্রের জনাব হেফাজতুর রহমান খান, আয়ুব খান, রশিদ উল্লা খান প্রমুখ। চুনতি গ্রামের অন্যান্য নামকরা শিকারিদের মধ্যে ছিলেন ইব্রাহিম, আজিজুর রহমান, জনাব মন্তসরুল ইসলাম, প্রফেসর হাবিবুর রহমান (তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের বিভাগীয় প্রধান), দেরাছ মিঞা এবং লুৎফর রহমান। ইতোমধ্যে উনাদের অনেকেই ইহধাম ত্যাগ করেছেন।

আহত সেই রয়েল বেঙ্গলটির কথায় আসা যাক। ডিপুটি সাহেব পরের দিন সূর্যোদয়ের পূর্বেই ঐ স্থানটির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। গন্তব্যস্থানে যাওয়ার রাস্তায় দেখতে পান অনেক লোক এক জায়গায় জড়ো হয়ে বসে আছে উনার অপেক্ষায়। তাদের দেখেই উনার বুঝতে বাকি থাকে না যে, বিগত রাত্রে বাঘটিকে গুলি করার খবর গ্রাম জুড়ে জানাজানি হওয়াতে ৩৫ জনের মত লোক বাঘ শিকারে তার সঙ্গী হওয়ার জন্য ভিড় জমিয়েছে। তাদের মধ্যে বন্দুকধারীও ছিল। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে চুনতি গ্রামটি শিকারের জন্য প্রসিদ্ধ বলে ঘরে ঘরে বন্দুকেরও অভাব ছিল

না। এত লোকজন দেখে তিনি তখন মন্তব্য করেন লটবহর নিয়ে আর যাই করা হোক না কেন বাঘ শিকার করতে যাওয়া সম্ভব নয়, তাও আবার গুরুতর আহত রয়েল বেঙ্গল এর খোঁজে। এতে ঝুঁকির পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। তিনি ৫ জন বন্দুকধারীসহ ১৫ জনকে সঙ্গে নেন এবং বাকি লোকজনকে ফিরিয়ে দেন।

আহত যে কোন প্রকার বাঘকে পায়ে হেঁটে ট্রেস করা যে কত বিপদসংকুল তা ডেপুটি সাহেব তার প্রকাশিত একটি পুস্তিকায় নিম্নরূপে বর্ণনা দিয়েছেন। "অন্ধকার রাত্রে ঘন জঙ্গলের কোন হিংস্র জন্তুকে আহত অবস্থায় ফেলে আসার অর্থ ঐ এলাকার জনসাধারণকে একটা অনির্দিষ্ট বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া"। ঐ পুস্তিকায় তিনি আরও উল্লেখ করেছেন "প্রসিদ্ধ হিংস্র জন্তু শিকারি ব্যারিস্টার কেএএন চৌধুরী আহত বাঘ পায়ে হেঁটে অনুসরণ করার বিপদ সম্বন্ধে বার বার সাবধান করেছেন। আর নিয়তির পরিহাস নিজের উপদেশ পালন না করে তিনি আহত চিতা বাঘের অনুসরণ করতে গিয়ে নিজে তার হাতে প্রাণ হারান।" বরিশালের কালেক্টর নগেন্দ্র নাথ সেনও এভাবে মৃত্যুবরণ করেন। প্রায় ১০০ বছর পূর্বে ঢাকার কালেক্টর বিটসন বেল সমতল ভূমিতে একটি চিতাবাঘকে গুলি করার পর ওটার কবলে পতিত হন। তার আর্দালি জীবন বাজি রেখে চিতাবাঘটির কাছ থেকে তাকে উদ্ধার করার পর যখন তার হুশ ফিরে আসে তখন তিনি মন্তব্য করেছিলেন– "আমি ভেবেছিলাম এটা একটি বিড়ালমাত্র, কিন্তু সে যে আমাকে ইঁদুর বানিয়ে খাবে তা বুঝতে পারিনি"।

শিকারি দল ঘটনাস্থলে পৌছে দেখল আহত রয়েল বেঙ্গলটি মরা গরুটি খেতে আসেনি ঐ রাত্রে। বাঘটির রক্তক্ষরণের ধারা থেকে অনুমার করা যাচ্ছিল বাম কানে গুলি বিঁধেছে বাঘটির। ডেপুটি সাহেব আরও সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে বাঘটি ট্রেস করার সিদ্ধান্ত নেন। দৃষ্টি অবরুদ্ধ করা দুর্গম জঙ্গলের ভেতর দিয়ে শিকারিদল নিয়ে তিনি এগুতে লাগলেন। সবার সামনে ডেপুটি সাহেব পেছনে অনুগমনকারী পাঁচজন বন্দুকধারীসহ আরও প্রায় ১৫ জন লোক। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তারা একটি গর্জন গাছের গোড়ায় পৌছে যান। ওখানে স্পষ্ট দেখেন শুকনা পাতার উপর বাঘটির পায়ের ছাপ পড়েছে এবং কিছু কিছু জায়গায় ওটার রক্ত পড়ে জমে গেছে। আড়াআড়িভাবে পড়ে থাকা একটি কাটা গর্জন গাছের কাণ্ডের উপর দিয়ে লাফিয়ে পার হয়েছে বাঘটি। তার প্রমাণও পাওয়া গেল, গাছের ছালের সাথে বাঘের বুকের ও পেটের রোম লেগে আছে। দুর্গম কাঁটাঝোপের মধ্য দিয়ে অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে এগুতে হচ্ছে শিকারি দলটিকে। গা ঝিম ঝিম করা ভয়ঙ্কর পরিবেশ, স্নায়ুর উপর এ সময় প্রচণ্ড চাপ অনুভূত হয় শিকারিদের। যে কোন মুহূর্তে আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে। বন্দুকধারীসহ দলের সব লোক পিছনে আর ডেপুটি সাহেব সবার অগ্রভাগে।

কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তারা একটি বড় বেতবনের ঝোপ দেখতে পান। ঝোপের মধ্য দিয়ে পাহাড়ি ঝরণা প্রবাহিত হচ্ছে। ঝোপটি দেখে ডেপুটি সাহেবের দৃঢ় ধারণা হয়, ঝোপের মধ্যে বাঘটি থাকতে পারে। ওটার কাছে আসতেই ভেতর থেকে "ফোস" করে আওয়াজ শোনা যায়। তখন তিনি বলে উঠলেন "বাঘ জীবিত আছে"। ভয়কে জয় করে এতক্ষণ যারা বাঘ শিকারে সঙ্গী হতে চেয়েছিলেন, ডেপুটি সাহেবের মুখের থেকে এ কথা শোনার সাথে সাথে অনেকে দিশেহারা হয়ে পালাবার জন্য উদ্যত হয়ে পড়ে। দলের প্রবীণ শিকারি ইব্রাহিম বলে ওঠে "দাদা আমাকে একবার বাঘে ধরেছে, আমি আর এগুতে পারছি না"। তিনি তখন বললেন, "ভয় হলে আস্তে সরে পড়"। ইব্রাহিম পেছনে ফিরেছে লক্ষ্য করে বাকি কয়জন তার মধ্যে বন্দুকধারীও ছিল, তাকে পেছনে ফেলে পালাবার পথ ধরে। নিচের দিকে লক্ষ্য না রেখে পালাতে গিয়ে তিন চার জন হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে বাঘটি দুবার বিকট হুঙ্কার করে সমতল ভূমিতে লাফিয়ে পড়ে। ডেপুটি সাহেবের শামছু নামক জনৈক অনুচর পালাবার পথ না পেয়ে উনার কোমর জড়িয়ে ধরে কাঁপতে থাকে। তিনি অকস্মাৎ "খবরদার" "খবরদার" করে আওয়াজ করতে থাকেন। এতে বাঘটি চকিত হয়ে তাঁর দিকে তাকাতেই ডেপুটি সাহেবের বন্দুক গর্জে ওঠে। একটু পর দ্বিতীয় গুলি করেন। যদিও তার প্রয়োজন ছিল না। কারণ প্রথম গুলিতেই বাঘটির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। এরপর দু একজন বন্দুকধারী যারা অদূরে অবস্থান নিয়েছিল বাঘটি লক্ষ্য করে গুলি করতে থাকে। তাদেরকে বারংবার গুলি করতে বারণ করা হয়।

ডেপুটি সাহেবের ১০ ফুট দূরত্বের মধ্যে ছিল বাঘটি। আর পলায়মান লোকগুলো যারা হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিল তাদের দূরত্ব ছিল বাঘটির থেকে পনের ফুটের মধ্যে। বাঘটি ছিল ছোটখাট একটি ঘোড়ার সমান। উচ্চতায় চার ফুট এবং লম্বা নয় ফুটের মত ছিল। প্রকৃত একটি রয়েল বেঙ্গল টাইগার। ক্যাম্পে নিয়ে আসার পর বাঘটি পরীক্ষা করে দেখা গেল ওঠার বাঁ চোখটিতে গুলিবিদ্ধ হয়ে ওটা কানা হয়ে গিয়েছিল এবং বাম হাতের কব্জিটিও ছিল ভাঙ্গা। উনার প্রথম দিনের গুলির ফলে চোখের এ দশা হয়েছে। অবশ্য এ জন্যই বাঘটি অনেক নিকট থেকেও ডেপুটি সাহেবকে দেখতে পায়নি। এক চোখ কানা হয়ে যাওয়ার জন্য বাঘটি উনাকে পার্শ্বে রেখে অন্য দিকে লোকজন ধাওয়া করছিল। তা না হলে পরিস্থিতি হয়ত বা অন্য রকম হত।

এই শিকার ঘটনা ব্যতীত ডেপুটি কবির উদ্দিন আহমদ খানের আরও অনেক বীরত্বপূর্ণ শিকারের কাহিনী এ অঞ্চলে বহুলভাবে শোনা যায়। ৬০ এর দশকের দিকে ডেপুটি সাহেব কর্তৃক রচিত এবং প্রকাশিত শিকারের একটি ছোট পুস্তিকা থেকে চট্টগ্রাম বনাঞ্চলে উনার নিজের কয়েকটি প্রকৃত শিকারের গল্প এখানে উদ্ধৃত হল।

কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তারা একটি বড় বেতবনের ঝোপ দেখতে পান। ঝোপের মধ্য দিয়ে পাহাড়ি ঝরণা প্রবাহিত হচ্ছে। ঝোপটি দেখে ডেপুটি সাহেবের দৃঢ় ধারণা হয়, ঝোপের মধ্যে বাঘটি থাকতে পারে। ওটার কাছে আসতেই ভেতর থেকে "ফোস" করে আওয়াজ শোনা যায়। তখন তিনি বলে উঠলেন "বাঘ জীবিত আছে"। ভয়কে জয় করে এতক্ষণ যারা বাঘ শিকারে সঙ্গী হতে চেয়েছিলেন, ডেপুটি সাহেবের মুখের থেকে এ কথা শোনার সাথে সাথে অনেকে দিশেহারা হয়ে পালাবার জন্য উদ্যত হয়ে পড়ে। দলের প্রবীণ শিকারি ইব্রাহিম বলে ওঠে "দাদা আমাকে একবার বাঘে ধরেছে, আমি আর এগুতে পারছি না"। তিনি তখন বললেন, "ভয় হলে আস্তে সরে পড়"। ইব্রাহিম পেছনে ফিরেছে লক্ষ্য করে বাকি কয়জন তার মধ্যে বন্দুকধারীও ছিল, তাকে পেছনে ফেলে পালাবার পথ ধরে। নিচের দিকে লক্ষ্য না রেখে পালাতে গিয়ে তিন চার জন হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে বাঘটি দুবার বিকট হুঙ্কার করে সমতল ভূমিতে লাফিয়ে পড়ে। ডেপুটি সাহেবের শামছু নামক জনৈক অনুচর পালাবার পথ না পেয়ে উনার কোমর জড়িয়ে ধরে কাঁপতে থাকে। তিনি অকস্মাৎ "খবরদার" "খবরদার" করে আওয়াজ করতে থাকেন। এতে বাঘটি চকিত হয়ে তাঁর দিকে তাকাতেই ডেপুটি সাহেবের বন্দুক গর্জে ওঠে। একটু পর দ্বিতীয় গুলি করেন। যদিও তার প্রয়োজন ছিল না। কারণ প্রথম গুলিতেই বাঘটির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। এরপর দু একজন বন্দুকধারী যারা অদূরে অবস্থান নিয়েছিল বাঘটি লক্ষ্য করে গুলি করতে থাকে। তাদেরকে বারংবার গুলি করতে বারণ করা হয়।

ডেপুটি সাহেবের ১০ ফুট দূরত্বের মধ্যে ছিল বাঘটি। আর পলায়মান লোকগুলো যারা হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিল তাদের দূরত্ব ছিল বাঘটির থেকে পনের ফুটের মধ্যে। বাঘটি ছিল ছোটখাট একটি ঘোড়ার সমান। উচ্চতায় চার ফুট এবং লম্বা নয় ফুটের মত ছিল। প্রকৃত একটি রয়েল বেঙ্গল টাইগার। ক্যাম্পে নিয়ে আসার পর বাঘটি পরীক্ষা করে দেখা গেল ওঠার বাঁ চোখটিতে গুলিবিদ্ধ হয়ে ওটা কানা হয়ে গিয়েছিল এবং বাম হাতের কব্জিটিও ছিল ভাঙ্গা। উনার প্রথম দিনের গুলির ফলে চোখের এ দশা হয়েছে। অবশ্য এ জন্যই বাঘটি অনেক নিকট থেকেও ডেপুটি সাহেবকে দেখতে পায়নি। এক চোখ কানা হয়ে যাওয়ার জন্য বাঘটি উনাকে পার্শ্বে রেখে অন্য দিকে লোকজন ধাওয়া করছিল। তা না হলে পরিস্থিতি হয়ত বা অন্য রকম হত।

এই শিকার ঘটনা ব্যতীত ডেপুটি কবির উদ্দিন আহমদ খানের আরও অনেক বীরত্বপূর্ণ শিকারের কাহিনী এ অঞ্চলে বহুলভাবে শোনা যায়। ৬০ এর দশকের দিকে ডেপুটি সাহেব কর্তৃক রচিত এবং প্রকাশিত শিকারের একটি ছোট পুস্তিকা থেকে চট্টগ্রাম বনাঞ্চলে উনার নিজের কয়েকটি প্রকৃত শিকারের গল্প এখানে উদ্ধৃত হল।

আমার শিকার জীবন

(কবির উদ্দিন আহমদ খান)

১. শিকারের হাতেখড়ি ঃ আমার পিতামহ নাসির উদ্দীন আহমদ খাঁন ছিলেন হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রঃ) থেকে চল্লিশতম অধস্তন পুরুষ। লর্ড এলেন বরোর আমলে (১৮৪২ থেকে ১৮৪৪) ডেপুটি কালেক্টর পদের প্রবর্তন হলে, চট্টগ্রামের আদি তিন জন মুসলমান ডেপুটি কালেক্টরের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। ১৮৬৭ সালের ২৭শে জুলাই মাত্র তিপ্পান্ন বছর বয়সে তিনি এন্তেকাল করেন। তিনি একজন দক্ষ শিকারি ছিলেন। তখন দেশে শিকারও ছিল প্রচুর। শিকার আমাদের বংশগত প্রেরণা। আব্বা বলতেন ঃ আমার আব্বা নাসির উদ্দিন খাঁন ডেপুটি যখন সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে শিকারে যেতেন তখন বনে-জঙ্গলে চার-পাঁচ দিন কাটাতেন। বড় বড় হরিণ শিকার করতেন। খেয়ে দেয়ে যা বাঁচত তা নিয়ে বাড়ি ফিরতেন। কোন বার শিকার পাওয়া না গেলে দুই মাইল দূরবর্তী খামার বাড়িতে উঠে তাঁর পছন্দ মত সবচেয়ে লায়েক ষাঁড়টিকে শিকার করে বাড়ি ফিরতেন। তার জীবনে অনেক বাঘ মেরেছেন। তার মধ্যে কতকগুলি ছিল নরখাদক। আব্বা তৈয়ব উল্লা খাঁ ছিলেন পুলিশ কর্মকর্তা। দক্ষতাও অন্যান্য অনেক গুণের জন্য সরকার তাকে একটি সোনার ঘড়ি উপহার দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন। তার অনন্যসাধারণ লক্ষ্যভেদ সে কালে এক প্রবাদে পরিণত হয়েছিল।

আমি নিজে বন্দুক নাড়াচাড়া আরম্ভ করি ১৯০৯ সন থেকে। ১৯১৮ সনে পড়াশুনা শেষ করে বাড়ি ফিরেছিলাম। সে বছর আমাদের বাড়ি থেকে তিনমাইল দূরে পার্বত্য অঞ্চলে হাতির খেদা দিয়েছিলেন ধুম নিবাসী রায় বাহাদুর গোলক চন্দ্র রায়ের পুত্রগণ। আমি তাঁদের সঙ্গে থেকে খেদার ব্যাপারে আদ্যোপান্ত দেখার সুযোগ পেয়েছিলুম। এ উপলক্ষে প্রায় দুই মাস বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াই। এতে শিকারের প্রতি আমার আকর্ষণ বেড়ে যায়। কিছুদিন পরে হাটহাজারির ওমর মিঞা জমিদারের খেদায় আমি অংশীদার হয়ে পড়ি। এরা পুরুষানুক্রমে খেদা অনুষ্ঠানের কাজ করতেন। এ সময় পার্বত্য অঞ্চলের ভাণ্ডাল জুড়ি এলাকায় শিকার করে বেড়াই। আমার শিকার জীবনের এ পর্ব চলে ১৯২০ সাল পর্যন্ত। ১৯২৩ থেকে ৪০ বছর পর্যন্ত আমার জীবন কাটে ফেনী, রাজশাহী, রংপুর এবং তমলুকে।এ সময়ে শিকার করি নানাবিধ জলচর প্রাণী। বিশেষ করে 'চখা' এবং 'রাজহাঁস' শিকারের ঘটনা সব সময় মনে জাগ্রত হয়।

২। **প্রথম গয়াল শিকার ঃ** এইটা পার্বত্য অঞ্চলের বড় শিকারের পালা। ১৯২৩ সালে চাকরি থেকে ছুটি নিয়ে বাড়ি এসেছিলাম, শিকারে বেরুলাম চকরিয়া থানার ফাস্যাখালি এলাকায়। সঙ্গে বারো জন বন্দুকধারী শিকারি আর চব্বিশ জন সাঙ্গপাঙ্গ। ১৪ দিন ঘুরে দেখা পেলাম এক জোড়া গয়ালের। একটির গায়ে গুলি লাগালাম। অতঃপর চললো পদচিহ্ন অনুসরণ করে আরো কাছে যাওয়ার পালা। এর ভার থাকলো দুই বন্দুকধারীর উপর। কিন্তু তারা গয়ালের কোন উদ্দেশই করতে পারলো না। পরে জেনেছিলাম তারা দিশেহারা হয়ে যায়, যে গয়ালটি গুলি খেয়েছিল সেটিকে পিছন ফেলে অক্ষত গয়ালটির পিছু নিয়েছিল। কিন্তু গয়ালটি তাদের দৃষ্টির বাইরে পালিয়ে যায়। তাদের বিফলতায় বিরক্ত হয়ে আমরা বাড়ি ফিরে এসেছিলাম। কিন্তু আমার সন্দেহ কিছুতেই ঘুচতে চাচ্ছিল না। সাত দিন বিশ্রাম করে আমরা আবার শিকারে বেরুলাম। এবার অধিকন্তু সঙ্গে ছিলেন বিশিষ্ট শিকারি হাজি সৈয়দ আহমদ সাহেব। আগের জায়গায় ফিরে এলাম। শুনলাম আহত গয়ালটিকে বাঘে খেয়েছে। ঘটনাস্থলে গিয়ে আলামত পেলাম, গোটা পাঁচ বাঘ মিলে গয়ালটিকে সাবাড় করেছে। পড়ে আছে শুধু তার কঙ্কাল।

এবারও গয়ালের ঝাঁকের পদচিহ্ন পাওয়া গেল। সে চিহ্ন ধরে তিনদিন অনবরত অনুসরণ করলাম। সূর্যাস্তের কিছু পূর্বে একটি বাঘ আমাদের চোখে পড়লে আমার উদীয়মান সাগরেদ মোহাম্মদ হোসেন পেছন থেকে একটি গয়ালের উপর গুলি চালিয়ে দিলে গয়ালের ঝাঁক পালিয়ে গেল। আমরা এগিয়ে গিয়ে কোথাও রক্তের চিহ্ন দেখতে পেলাম না, অগত্যা ক্যাম্পে ফিরে এলাম। সকালে বের হয়ে আমরা দু'দলে বিভক্ত হলাম। আমাদের এক দল আহত গয়ালটি খোঁজ করতে করতে উঠলাম এক পাহাড়ের শীর্ষে। সেখানে প্রচুর জমাট রক্ত দেখতে পেলাম। নীচের দিকে দৃষ্টি দিয়েই দেখা গেল গয়ালটি একটি গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তিন গুলি করে তকে ধরাশায়ী করলাম এবং কানের ভিতর বন্দুক ধরে জবেহ কার্যসমাধা করলাম। সঙ্গীদের সাহায্যে এটাই আমার প্রথম গয়াল শিকার। ততক্ষণে আমাদের শিকারি দলে লোক জুটে গিয়েছিল ৪৮ জন। বারো জন পাহাড়ির সাহায্যে গয়ালটিকে পাহাড়ের গা থেকে নিচে নামিয়ে আনা গেল। বারো জনকে পুরস্কার দিতে হলো বারো থুরম (ঝুড়ি) মাংস। সকলে মিলে আমরা গোসতো দু'বেলা আহার করলাম। তারপরও বাকি থাকলো যেটা সেটা আমার বাড়ি পর্যন্ত বয়ে আনতে ১৮ জন লোকের গলদঘর্ম হয়ে গেল। গয়ালটির ওজন কোনক্রমেই ১৬ মণের কম হতো না।

গয়াল সম্বন্ধে আমার এই ধারণা যে, স্বাভাবিক অবস্থায় এই জন্তু মানুষকে এড়িয়ে চলে। কিন্তু, বাইসন (গয়াল) ভীষণ ইহার মূর্তি, আহত হ'লে ছুটে চলে যমদূত গতি।

৮০ বছর আগে গয়াল শিকারে বের হয়ে আমার জেঠামনি মরহুম আজিজুল্লা খান (এই বই এর লেখকের পিতামহ) একবার বিপদে পড়েছিলেন। তাঁর আপাদমস্তক ছিল পোশাকে ঢাকা। পাহাড়ের চূড়ায় ছিলেন তিনি। নিচে শন খোলায় কতকগুলি গয়াল চরছে। অমনি গুলি করেন। গুলি লাগে একটা গয়ালের কাঁধে। গয়াল উর্ধ্বশ্বাসে তার দিকে ছুটে আসছিল। কোন বড় গাছ দেখে ওঠার সময় ছিল না। তিনি পাশের দুর্গম ঝোপে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েন। গয়াল তাকে দেখতে পায়নি। কিন্তু ঘ্রাণে অনুমান করে তিনি কোথায় লুকিয়েছেন। তখন তাঁর মুখের উপর দিকে নাক ঘসতে থাকে (অবশ্য লতাপাতার উপর দিয়ে)। এতে তার মুখের উপর ডান দিক ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। ক্ষতের দাগ নিয়ে তাঁকে কবরে যেতে হয়েছিল। এক বিখ্যাত আমেরিকান শিকারির উক্তি, যে কোন ভাষায় নাম হোক, গয়াল অত্যন্ত বদ প্রাণী।

(১৯৩৮ থেকে ৪০) এ কর্মজীবনে ফেনীর নিক পরিষাদি সংলগ্ন পার্বত্য ত্রিপুরা অঞ্চলে গয়াল শিকার করি। আমার বড় ছেলেও সঙ্গে ছিল। প্রথম গুলিতেই সে গয়ালটিকে ধরাশায়ী করে। ধাক্কা সামলে নিয়ে গয়ালটি উঠে খুব দ্রুত গতিতে পালাতে থাকে। আমি ছেলেকে নিরাপদ স্থানে রেখে তার পিছু নিই। সঙ্গে তিনজন অনুচর। প্রায় চার ঘণ্টা ধাওয়া করে এবং পর্যায়ক্রমে লুকোচুরি খেলে আরও তিন গুলি ওটাকে লাগান গেল। শেষ পর্যন্ত আমার গুলিতে গয়ালটি শেষ বারের মত ধরাশায়ী হলো। আমরা ওটাকে জবেহ করলাম। আমার কাছে ত্রিপুরা রাজ্যের শিকারের লাইসেন্স ছিল। কিন্তু এই রাজ্যে গয়াল গরু শ্রেণীভুক্ত। আমি মনে করতাম গয়াল মহিষ শ্রেণীভুক্ত। রাজ্যে গো হত্যা নিষিদ্ধ ছিল। আমার গয়াল শিকার নিয়ে এক সেসন কেস দায়ের হয়ে গেল। অপরাধ গো হত্যা। সঙ্গে কল্পিত নরহত্যাও। তবে সামান্য তদবিরেই এ বিপদ অঙ্কুরেই বিনাশ হয়ে গেল। ত্রিপুরাধিপতির আদেশে অভিযোগকারী পক্ষ নিজ খরচে মোকদ্দমা উঠিয়ে নিলেন।

৩। প্রথম বাঘ শিকার ঃ সব শিকারিদের ন্যায় আমারও আগ্রহ ছিল বাঘ মারার। বাঘের তালাশে অনেক মাচানে বিনিদ্র রাত কাটিয়েছি। কিন্তু কোন পূর্ণ বয়স্ক বাঘের সঙ্গে ১৯৪৩ সালের আগে মোলাকাত হয়নি। সে সালে শুরু হয়েছে একটা দুর্দান্ত চিতাবাঘের লীলাখেলা। খবর পেলাম পরপর পাঁচটি গরু মেরেছে। তাজা খবর হলো শেষ গরুটা মেরেছে আমার বাড়ির অনতিদূরে এক মাইলের মধ্যে। তাও আবার দিনের বেলায়। শিকার করা গরুটাকে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রেখে খাওয়ার উদ্দেশ্যে নিকটেই বাঘটি রাত্রির অন্ধকারের অপেক্ষা করছে। শেষ বেলা দু'জন অনুচরসহ ঘটনাস্থলে গিয়ে মাচা বাঁধলুম। ঝোপ থেকে গরুটিকে টেনে এনে চলাচলের পথের উপর রাখলাম। গরুটি খুব বড় আকারের। তদুপরি

ফুলে গিয়ে আরও বড় দেখাচ্ছে। অনুচরদের নিয়ে নিজের বন্দুক হাতে মাচানে বসে আছি। ভাদ্র মাস, মেঘলা দিন, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। এমন সময় অনুচরদের একজন বলল, আমি বাঘ দেখতে পাচ্ছি। বাঘ তখন গরুর আড়ালে। আমার ক্ষীণ দৃষ্টি অন্ধকারের মধ্যে অত দূর পৌছায়নি। আমি ওর হাতে বন্দুক দিয়ে বললাম মার। কিন্তু মারবে কি? ইতিমধ্যেই সে কাঁপতে শুরু করেছে। আমি তার হাত থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নিলাম। অপর অনুচরকে বললাম টর্চ মার। টর্চের আলো গিয়ে পড়লো বাঘের মাথার পিছনে। বাঘ তখনও গরুর আড়ালে শায়িত অবস্থায়। আলো পড়ার সঙ্গে সে মাথা ঘুরিয়ে উপর দিকে তাকিয়ে দেখলো। তার দুটি চোখই এক সঙ্গে জ্বলে উঠলো। আমি তখনই চোখ নিশান করে ফায়ার করলাম। বাঘ ধরাশায়ী হয়ে গেল। তথাপি রীতিমত দ্বিতীয় গুলি করলাম। বাঘ একই অবস্থায় থেকে গেল। নেমে এসে দেখলাম প্রথম গুলি বাঘের মস্তিষ্কের তন্ত্রী ভেদ করে মাথার পেছন দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে। আমার বিশ্বাস দ্বিতীয় গুলির আওয়াজ শোনবার আগেই প্রাণ ত্যাগ করেছে। তৃতীয় গুলি মারালাম সেই ভিতু অনুচরকে দিয়ে। বললুম জ্যান্ত বাঘের ভয় এখন নেই। বাঘ মারার খবর পেয়ে সরকারি রাস্তা থেকে বাঘ দেখতে বহু লোক এখানে জড়ো হয়ে গেল। তারা উৎসাহে বাঘ বয়ে নিয়ে আমাদের বাড়ি পর্যন্ত পৌছিয়ে দিল। রাত তখন ৮টা। জনতার সামনেই মেপে দেখা গেল বাঘটি দৈর্ঘ্যে ৭ ফুট ৮ ইঞ্চি। চিতা বাঘ সচরাচর ৭ ফুটের বেশি হয় না। সুতরাং এটা একটি সর্ববৃহৎ চিতার দৃষ্টান্ত।

৪। **হরিণ শিকার ঃ** হরিণ শিকার অনেক করেছি। ১৯৪০ থেকে ৪৩ পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের রামগড় মহকুমায় অবস্থান কালে ছোট হরিণ অনেক শিকার করে যথেষ্ট আনন্দ পেয়েছি। ১৯৪৫ থেকে ৫৩ পর্যন্ত ময়মনসিংহ জিলার মধুপুরের গড়ে হরিণ শিকার করেছি। শিকার জীবনে পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য স্থানেও অনেক ছোট হরিণ মেরেছি। জলপাইগুড়িতে মেরেছি অনেক পীতবর্ণ এবং মিশ্র দাগবিশিষ্ট হরিণ। চট্টগ্রামে আমার বাড়ির ৮/১০ মাইলের মধ্যেও অনেক বড় হরিণ মেরেছি। এই এলাকার বেশির ভাগ পড়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামে। বড় হরিণ যে কয়টি মেরেছি সব কটাই হয় দৌড়ের মধ্যে নয় লাফ দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে এই সময় গুলি মেরেছি।

১৯৫৫ সনে খবর পেলাম আমার বাড়ির ছয় মাইল দূরে একটি অতিকায় বড় হরিণ এসেছে। অনুচরদের পাঠিয়ে দিলুম খোঁজ নিতে। তারা এসে বল্লো, পায়ের দাগ মেপে মনে হচ্ছে এটা একটা তিন পোয়া গয়াল। অর্থাৎ এত বড় হরিণ প্রায় গয়ালের সমান হবে। পরের দিন শুভ দেখে শিকারে বেরুলাম সঙ্গে চার জন অভিজ্ঞ শিকারি। এক জায়গায় এসে মনে হলো হরিণটা বোধ হয় এখানেই আছে। এটা একটা জঙ্গল। জঙ্গলটার চারিদিকে একটা চক্কর দিয়ে এলাম। কতক

অনুচরদের জঙ্গলে ঢুকাতে দিলুম। যে সব পথে হরিণ বের হতে পারে বলে মনে হলো প্রত্যেকটির মুখে এক একজন শিকারি বসিয়ে দিলুম। সব এলাকা মোটামুটি ঘিরে রয়েছে একটা পাহাড়ি স্রোত। আমি চক্কর দিয়ে সব তদারক করতে লাগলুম। একজন শিকারি পেয়ে গেছে বেশ এটা চওড়া জায়গা। তিনি আমাকে ডেকে বল্লেন, এ জায়গাটি বেশ, আপনি এখানে থাকুন। আমি বল্লুম কোন সঙ্গীকে উঠিয়ে দিয়ে নিজে বসা তো নেতার ধর্ম না? আপনি সাবধানে বসে থাকুন। আমি আরো তিনশত গজ গিয়ে একই রেখার একটা ঝোপের ভিতর আসন নিলুম। হঠাৎ যেন আমার চোখে ধাঁধাঁ লাগল। এটা ধাঁধাঁ না। অনুচরদের হাঁকেডাকে চকিত হয়ে আমার সম্মুখ দিয়ে হরিণের পলায়ন। এ জ্ঞান যখন আমার হলো তখন হরিণ লাফ দিয়ে স্রোত ডিঙ্গিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। হরিণ তখন আমার একশ গজ দূরে। আমি সঙ্গে সঙ্গেই গুলি করলুম। হরিণ তখন বাতাসে ভর করছে, কিন্তু নিশান থেকে একগজ আন্দাজ দূরে, গুলি লেগেছে তার তলপেটে। তলপেট কেটে ভুঁড়ি বেরিয়ে পড়লো, ছোটার তখনও বিরাম নেই। অল্প কিছুদূর অনুসরণ করেই হরিণ মাটিতে লুটিয়ে পড়লো, গুলির আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গেই সকলে চারিদিক থেকে এসে পড়েছিল। তারা হরিণটিকে জবেহ করলো। এটা সাধারণ বড় হরিণ নয়, এটা একটা অতিকায় "এন্টিলোপ'। এ এলাকায় এরূপ হরিণ আমি আর দেখতে পাইনি। এর পা বেশ মোটা। ওজন ছিল প্রায় নয় মণ।

৫। **পাখি শিকার** ঃ এটা একটা অন্য এক ধরনের আমোদ। এতে বিপদের আশংকা কম। তবে, আমোদ হালকা হলেও থ্রিল কিছু মাত্র কম নয়। রাজহাঁস ও চখা প্রচুর শিকার করেছি পদ্মা ও ধলেশ্বরী নদীতে, মানিকগঞ্জে ১৯৩৬-৩৭ সালে, ফেনীতে শান্তিরহাট থেকে মিঞা জান ঘাটের নিকটবর্তী ফেনী নদীর মোহনা পর্যন্ত এলাকায় ১৯৩৮ থেকে ৪০ সালে। বন-মোরগ ও মথুরী আক্লেশে শিকার করেছি পার্বত্য চট্টগ্রামের রামগড় মহকুমায় ১৯৪০ থেকে ৪৩ পর্যন্ত। পরবর্তী তিন বছর কেটেছে জামালপুর এবং নোয়াখালী এলাকায় প্রচুর জলচর পাখি শিকার করে। ১৯৫০ পর্যন্ত পরবর্তী তিন বছর কেটেছে ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্ট জেলায় জলচর-পাখি শিকারে। তবে, স্মৃতিতে সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে আছে মধুপুরের বন-মোরগ এবং ছোট হরিণ শিকার।

১৯৪৪ সনে যশোর সদরে থাকাকালে একবার উপর্যুপরি দুই গুলিতে অনেকগুলি স্নাইপ মেরেছিলাম। জবেহ করার সময় গুণতির মধ্যে ১৩৫টি পাওয়া গিয়েছিল। গভীর জঙ্গলে ঝোপেঝাড়ে যে আরও অনেক হারিয়ে গিয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নাই। মনে পড়ে ১৯৪৬ সালে তিস্তা নদীতে অনেক রাজহাঁস ও চখা শিকার করেছিলাম। এই সময় জলপাইগুড়ির অভ্যন্তরে এবং হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে শিকার করার সুযোগ হয়েছিল। ওখানে আমি প্রচুর হরিণ শিকার করি।

যতদূর মনে পড়ে ১৯৩৪ সালের মধ্য ভাগে জনাব ওমদতুল ইসলাম আমাদের বাড়িতে শিকার উপলক্ষ্যে মেহমান হন। অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় আমি তাঁর সংগে বেরুতে পারিনি। তবে আমার দু'জন বাছা অনুচর ও লোকজন সঙ্গে দিয়ে তাঁকে ছয় মাইল দূরবর্তী গজলিয়া বনে পাঠাই। তাঁদের দলের আহমদুর রহমান মুন্সী একটি অজগরকে গুলি করে মারেন। ওটার পেট ফাড়ার সময় দেখা যায় যে পেটে আস্ত একটি বাচ্চা হরিণ রয়েছে। দলের তৈয়ব উল্লাহ সওদাগর একটি বড় হরিণকে গুলি করেন। কিন্তু ওটার আর কোন পাত্তা পাওয়া যায় নি।

একবার বাঘের সন্ধানে করতোয়া নদীর উৎপত্তি স্থানের কাছাকাছি গিয়েছিলুম। হিমালয়ের পাদদেশের বাঘ আকারে সম্ভবত সবচেয়ে বড়। কিন্তু বাঘ মারার সুযোগ পেয়েও সমস্ত সম্ভাবনা পেছনে ফেলে ক্যাম্পে ফিরে আসতে হয়। সেদিন শিকারে বেরুবার পূর্বে অত্যধিক মাথা ধরেছিল। উপশমের জন্য কিছু সেরিডন খেয়ে নিয়েছিলাম। কিন্তু ওটা ছিল আসলে কুইনাইন। অকুস্থলে পৌছে আমি ভুল বুঝতে পারি। ইতোমধ্যে মাথাধরা কমবে কি আরও চরমে উঠেছিল। অগত্যা ক্যাম্পে ফিরে আসতে হয়।

পঞ্চাশ বছরের শিকারি জীবন। পশুপাখির চাল চরিত্র সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা করা যেতো। কিন্তু সময়াভাব। আল্লাহতালার অশেষ শুকরিয়া। এই দীর্ঘ কালে আমি এমন কোন ঘটনার কারণ হইনি যাতে কারো কোন জখম হয়েছে বা কারুর জীবন বিপন্ন হয়েছে। আমার নীতি ছিল ঃ বরং শিকার ছেড়ে দেওয়া কিন্তু কিসের উপর গুলি করছি সেটা সঠিক রূপে দেখার আগে গুলি না করা।

জীবনে বহু কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি। কিন্তু সমস্ত ঝুঁকি নিজের ঘাড়ে নিয়ে সঙ্গীদের নিরাপদ রাখার মধ্যেই আমি সর্বাধিক আনন্দ পেয়েছি। ক্রীড়া সঙ্গীদের অনেকেই দেহত্যাগ করেছেন। আমিও তাঁদের পথের দিকে তাকিয়ে আছি। তামাম শোধ। ফী আমানিল্লাহ।

চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় বাঘ শিকারের বিচ্ছিন্ন কয়েকটি ঘটনা

বস্তুতপক্ষে শিকার বলতেই বন্য জন্তু-জানোয়ার শিকার করা বুঝায়। শুধু বাঘ শিকার এখানে প্রাধান্য পাওয়ার অন্যতম কারণ বাঘের উপস্থিতি অন্যান্য বন্য জন্তু সমূহের প্রচুর পরিমাণে থাকার সম্ভাবনা নিশ্চিত করে। চট্টগ্রামের বিভিন্ন বনাঞ্চল কয়েক দশক পূর্বেও যে রূপ বন্য জন্তু-জানোয়ারের বিচরণ ভূমি ছিল তার সম্যক ধারণা নিম্নের শিকার ঘটনাসমূহ হতে সহজে অনুমেয়। এসব শিকার কাহিনীগুলোতে সে সময়ে চট্টগ্রাম বনাঞ্চলের পরিবেশ এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থারও বিশদ বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

১। শীতলপুরে বাঘ ঃ ১৯৪০ দশকের দিকের ঢাকা-চট্টগ্রাম হাইওয়ের পার্শ্ববর্তী শীতলপুর নামক স্থানের একটি ঘটনা। শীতলপুরের পূর্ব দিকে তখন ছিল গহিন জঙ্গলে ঢাকা উঁচু পাহাড় এবং পশ্চিম দিকে বঙ্গোপসাগরের তীরে বিস্তৃত সমুদ্র চর। এ চরগুলোতে জোয়ারভাটার প্রভাবে প্রায় সময় কাঁকড়া, শামুক এবং ছোট ছোট মাছ আটকে পড়ে থাকত। এ কথা কারো অজানা নয় যে শিকার পাওয়া না গেলে বা প্রয়োজনীয় শিকার করতে অক্ষম হয়ে গেলে, ক্ষুধা নিবারণের জন্য অনেক সময় বাঘ এগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। ঐ সময়ে এরূপ একটি ঘটনা ঘটেছিল এ গ্রামে।

একটি বাঘ পাহাড় থেকে নেমে এসে জনবসতি পার হয়ে রাত্রে সমুদ্র চরে কাঁকড়া, শামুক, মাছ ইত্যাদির সন্ধানে রাত কাটিয়ে দেয়। কোন্ সময় যে ভোর হয়ে যায় বাঘটি বুঝতেও পারেনি। দিবালোক বেড়ে যাওয়ার পূর্বে জঙ্গলে পৌছতে পারবে কিনা বোধ হয় এ ভেবে সমুদ্র চরের কাছাকাছি একটি জঙ্গলের ঝোপের মধ্যে আশ্রয় নেয় বাঘটি। ঝোপটি ছিল বসতবাড়ির কাছাকাছি। প্রকৃতির ঢাকে সাড়া দিতে প্রত্যুষে গ্রামের লোকজন এ ঝোপের মধ্যে যেত। জনৈক গৃহস্থ বদনা হাতে ঝোপটির অভ্যন্তরে ঢুকতেই বাঘটির সামনাসামনি হয়ে যায়। দিশেহারা হয়ে 'বাঘ' 'বাঘ' করে চিৎকার করতে থাকে লোকটি। অনন্যোপায় হয়ে লোকটিকে মৃদু থাবা চালিয়ে বাঘ ঝোপের অন্যদিকে চলে যায়।

জঙ্গলটির অপর প্রান্তে ছোট একটি নালার পাশে মলত্যাগে রত ছিল আর এক রাখাল। এ সময় ঝোপটির অন্য প্রান্তের চিৎকার শুনে হতচকিত অবস্থায় উঠে দাঁড়াতেই সে বাঘটির সামনাসামনি হয়ে যায়। হয়ত বা প্রথম লোকটির সহযোগী মনে করে রাখালটিকেও একটি থাবা লাগিয়ে বাঘটি অন্যত্র পালিয়ে যায়। আহত অবস্থায় এদেরকে বাড়িতে নিয়ে আসা হয় এবং চারিদিকে বাঘ বাঘ করে হইচই

রব উঠতে থাকে। জায়গাটি নিরাপদ নয় দেখে অন্যত্র পালাবার জন্য ঐ ঝোপ থেকে বের হয়ে যায় বাঘটি। মরিচ ক্ষেতের দুদিকে বাঁশের বেড়া ঘেরা রাস্তা দিয়ে দৌড়াচ্ছিল বাঘটি। কিছুদূর যেতে না যেতেই সেখানেও তিন চারজন লোকের মুখোমুখি হয়ে যায়। পালাবার রাস্তা না পেয়ে বাঘটি তাদেরকেও আক্রমণ করে বসে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই তাদের মধ্যে বাঘের থাবায় দুজন আহত হয়ে যায়। ওখান থেকে দৌড়ে গিয়ে এক চাষীর গরুর খোয়াড়ে ঢুকে পড়ে। লোকজনের হৈহল্লা শুনে এখানেও লুকানো সম্ভব নয় ভেবে দৌড় দিয়ে পূর্বের উল্লিখিত ঝোপের অদূরবর্তী আরেকটি জঙ্গলে ঢুকে পড়ে বাঘটি।

লাঠি, দা এবং হাতের কাছে যে যা পেয়েছিল তা নিয়ে গ্রামের লোকজন ছুটে আসে ঐ স্থানে, এর পর তারা জঙ্গলটি ঘিরে ফেলে। ইতোমধ্যে একজন বন্দুকধারীও তাদের সাথে যোগ দেয়। বন্দুকধারী লোকটি আর দু'জন লাঠি এবং দা নিয়ে খুব সন্তর্পণে জঙ্গলের মধ্যে বাঘটি ট্রেস করার জন্য ঢুকে পড়ে। সামান্য কিছুদূর এগুতেই একপাশ থেকে বাঘটি বিদ্যুৎবেগে পিছনের দু'জনের একজনকে আহত করে পালিয়ে যাচ্ছিল। এ সময় পিছন দিক থেকে ফায়ার করে এক বন্দুকধারী। তবে বাঘটির গায়ে যে গুলি লাগেনি তা বুঝা যাচ্ছিল ওটার পলায়নের গতি দেখে। এভাবে কয়েক ঘন্টার মধ্যে বাঘটি দ্বারা কিছু লোক আহত হয়ে যায়। তবুও লোকজন সম্ভাব্য একটি জঙ্গল ঘিরে রাখে এবং জঙ্গলের অভ্যন্তরে কয়েকটি স্থানে আগুন লাগিয়ে দেয়। এরি মধ্যে একজন আগের ঝোপটিতে বাঘ দেখা গেছে বলে চিৎকার দিয়ে ওঠে। বন্দুকধারী ও আর একজন কাছাকাছি গিয়ে কি জানি কি দেখে ফায়ার করে দেয় জঙ্গলের দিকে।

বাঘ আর মানুষ লুকোচুরি খেলার সময় পার্শ্ববর্তী গ্রামের আবু মিঞা নামে জনৈক নামকরা শিকারি এসে ওদের সাথে যোগ দেন। তিনি ঐ ঝোপটিতে না দেখে পার্শ্ববর্তী জঙ্গল আবৃত ছোট নালায় বাঘটি আছে কি না লক্ষ্য করতে থাকেন। ওখানেই দেখতে পান বাঘটি গুটিগুটি মেরে বসে আছে। বাঘটির মাথা লক্ষ্য করে গুলি করে সেখানেই ওটাকে ধরাশায়ী করেন। মৃত বাঘটি পরীক্ষা করে দেখা যায় ওটা একটা মাঝারি আকারের বাঘ। কোনরকম আহত কিম্বা অসুস্থ হওয়ার দরুন ওটা জঙ্গল ছেড়ে খাদ্যের সন্ধানে লোকালয়ের কাছে সমুদ্র সৈকতে আসেনি। জঙ্গলে খাদ্যাভাবের কারণেই ওটাকে দূরবর্তী সমুদ্রের চরে আসতে হয়েছে। ঘটনাটির বর্ণনা দিয়েছিলেন আবু মিঞার এক বন্ধু।

২। চা বাগানের নিকটে বাঘ ঃ পটিয়ার কাঞ্চন নগর রেল স্টেশন থেকে দু-তিন মাইল দূরে ১৯৪০ সালের দিকে জনৈক হাকিম সাহেবের একটি চা বাগান ছিল। যদিও বাগানটি ছিল এক ইংরেজ সাহেবের, বাগানের ম্যানেজার হাকিম সাহেব ছিলেন বলে ওটার নামকরণ করা হয়েছিল হাকিম সাবের চা বাগান। বাগানের কুলির সরদার রামকৃষ্ণের ছেলে মোহন হাকিম সাহেবের ব্যক্তিগত গরুর পাল নিয়ে প্রত্যহ চরাতে যেত জঙ্গলের ভিতরে এক-দেড় মাইল দূরে। তার সাথে

আরও কয়েক জন রাখাল ও অন্যান্যদের গরুগুলো জঙ্গলের অভ্যন্তরে এক সাথে নিয়ে যেত। একদিন দুপুরবেলা জঙ্গলের মধ্যে এক স্থানে সমতল ভূমিতে গরু গুলোকে ঘাস খেতে দিয়ে একটি বৃক্ষের ছায়ায় রাখালেরা খেলা করছিল। কোথা হতে একটি বৃহৎ আকৃতির বাঘ এসে পালের সব চাইতে বড়সড় গাভীটিকে আক্রমণ করে। একটু দূর থেকে এ দৃশ্য দেখে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে যায় রাখালেরা।

রাখাল মোহন বাঘের গল্প অনেক শুনেছে তবে কোন দিন বাঘ কর্তৃক গরু হত্যা করতে দেখেনি। সে যখন দেখল বাঘের চেয়ে আকারে গরুই বড়, তার হয়ত ধারণা হয়েছিল বাঘ গরুটিকে তেমন কিছু করতে পারবে না। মোহনসহ আরও দু'জন রাখাল বাঘটিকে ঢিল ছুড়তে ছুড়তে ওটার কাছাকাছি চলে আসে। এ অবস্থায় স্বভাবত বাঘ যা করে তাই করল। বাঘের শিকারে বাধা দেয়ার কারণে ক্ষিপ্ত হয়ে মোহনকে থাবা মেরে চিরতরে স্তব্ধ করে দেয় বাঘটি। এসব প্রত্যক্ষ করে আরও দু'জন রাখাল। তারা দৌড়ে এসে চা বাগানের কুলিদেরকে ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দেয়। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে চা বাগানের প্রায় ২০-৩০ জন কুলি লাঠিসোটা নিয়ে স্থানটির দিকে ছুটে যায়। সাথে তিনচার জন বন্দুকধারীও যোগ দেয়।

তারা গিয়ে দেখতে পায় বাঘটি গরুটির পাশে মৃত ছেলেটিকে পাহারা দিচ্ছে। জঙ্গলের দিকে পিছ দিয়ে ছেলেটিকে সামনে রেখে দু'পায়ের উপর বসে আছে। মনে হচ্ছিল যেন এ অবাঞ্ছিত মানব হত্যার জন্য অনুশোচনা করছে বাঘটি। লোকজনের উপস্থিতি এবং হৈ-হুল্লোড় যেন তোয়াক্কাই করছে না সেটি। জনগণ একটু কাছে এগুতে থাকলেই বিকট হুঙ্কার করে ভীতি প্রদর্শন করে বাঘটি। এ অবস্থায় বন্দুকের কয়েকটি ফাঁকা আওয়াজ করলে বাঘটি জঙ্গলের অভ্যন্তরে চলে যায়। অতঃপর রাখাল ছেলেটিকে নিয়ে এসে সৎকার করা হয়। এরপর বাঘটির খোঁজে জঙ্গলের অভ্যন্তরে অনেক শিকারি দিনরাত ঘুরাফিরা করে এবং পাহারার ব্যবস্থাও নেয়। কিন্তু বাঘটির আর সন্ধান পাওয়া যায়নি। হয়ত বা বাঘটি এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিল।

৩। লোকালয়ে বাঘ ঃ শীতের রাতের কনকনে শীত জঙ্গলের মধ্যে বাঘের জন্যও খুবই অসহনীয় ব্যাপার। তাই শীতের রাত্রে গহিন জঙ্গল হতে বাঘ বের হয়ে অনেক সময় লোকালয়ে চলে আসে এবং কোনখানে আগুনের সন্ধান পেলে তার পাশে চলে আসতে চায়। চট্টগ্রাম অঞ্চলে একটি প্রবাদ আছে "মাঘের শীতে বাঘ গুজরে (গর্জায়), ফাগুনের শীতে ব্রাহ্মণে গরু বেচে (বিক্রি করে)কাঁথা কিনে (ক্রয় করে)।"

পঞ্চাশ দশকের দিকের চট্টগ্রাম জেলার চুনতি গ্রামের একটি ঘটনা। জনৈক নূর আহমদ নামক একজন কৃষকের বাড়ি ছিল লোকালয় থেকে সামান্য দূরে জঙ্গলের পার্শ্বে পাহাড়ের ঢালুতে। নূর আহমদ নৈশ আহার শেষ করে কি যেন কাজে বাইরে গিয়েছিল। তার স্ত্রী এ সময়ে শুকনা কাঠের গুঁড়িতে আগুন দিয়ে

শীত নিবারণ করছিল ঘরের অভ্যন্তরে। একটু পর নিচের জমির একটি কুয়া হতে পানি আনার জন্য নূর আহমদের স্ত্রী বালতি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। তারা নিঃসন্তান ছিল বলে স্বামী-স্ত্রী ছাড়া বাড়িতে আর কেউ ছিল না। বালতি ভরে পানি নিয়ে ফিরে এসে দেখে আবছা মত কে যেন আগুনের পাশে বসে আছে। নূর আহমদ ফিরে এসেছে মনে করে সে আরও কাছে চলে যায়।

কাছে এসে উঁকি দিয়ে দেখে দু'পায়ের উপর ভর দিয়ে সানন্দে বসে আগুনে শরীর গরম করছে গরুর বাছুরের সমান একটি বাঘ। এ অবস্থায় তড়িৎ গতিতে বাহির থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে "বাঘ এসেছে" বলে চিৎকার করতে থাকে নূর আহমদের স্ত্রী। আকস্মিক এরূপ চিৎকার শুনে আশেপাশের লোকজনের যা হওয়ার তাই ঘটে যায়। লাঠিসোটা দা আগুন ইত্যাদি নিয়ে এসে লোকজন বাড়িটি ঘিরে ফেলে।

জনবসতিতে শীত নিবারণ করতে এসে এরূপ বিপাকে পড়তে হবে বুঝতে পারেনি নিরীহ বাঘটি। তাড়াতাড়ি ঘরের কোনায় লুকাতে চেষ্টা করে, কিন্তু কোনখানে তার শরীর সংকুলান না হওয়ায় অতিষ্ঠ হয়ে ঘরের এক কোনায় বসে থাকে। আগত লোকজনের মধ্যে কয়েকজন বন্দুকধারীও ছিল। নূর আহমদের ভাই মনির আহমদও একজন বন্দুকধারী শিকারি ছিল। বন্দুক হাতে মনির আহমদ ঘরের চালায় উঠে যায়। ঘরের চালা ছিদ্র করে টর্চ জ্বালাতেই বাঘটি তার চোখে পড়ে এবং গুলি করে বাঘটি হত্যা করে। এভাবে শুধু শীত নিবারণ করতে এসে একটি বাঘ প্রাণ হারায়।

ওস্তাদের শিক্ষা ঃ চুনতি গ্রামের নামকরা শিকারিদের মধ্যে একজন ছিলেন জনাব ইসরাইল খান (প্রয়াত কবি সুফিয়া কামালের ছোট দেওর, যিনি বেগম সুফিয়া কামালের ইহধাম ত্যাগ করার কিছুদিন পর ৩১-১২-৯৯ সালে ইন্তেকাল করেছেন)। তাঁর শিকারের গুরু ছিলেন চুনতির সুপরিচিত স্বনামধন্য শাহ সাহেব এর আব্বা হাজী সাহেব। হাজী সাহেব ইসরাইল খানকে শিকারের হাতে খড়ি দেয়ার প্রাক্কালে বলেছিলেন, "জঙ্গলের অভ্যন্তরে কোন দিন কোন বাঘের বাচ্চার সামনা সামনি হ'লে স্থির হয়ে দাঁড়ায়ে থাকতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত ওগুলো চলে না যায়"।

একদিন প্রত্যুষে বন মোরগের সন্ধানে তিনি গ্রাম থেকে প্রায় তিন মাইল দূরবর্তী দোছাইল্ল্যা নামক স্থানের উদ্দেশে রওনা হন। বন্দুক নিয়ে জঙ্গলের ভিতর সূর্য ওঠার পূর্বেই প্রবেশ করেন, পিছনে ছিল তাদের পুরানো গৃহ কর্মচারী হাশমত আলী। পাহাড়ি শৃঙ্গে উঠে সংকীর্ণ পথ ধরে নিচের দিকে নামছিলেন তারা। পিছন দিক থেকে হাশমত হঠাৎ ডাক দিয়ে বলল, "দাদা সাবধান উপরে দেখুন"। উপরে তাকিয়ে ইসরাইল খান দেখেন এক বিরাট অজগর একটি বটবৃক্ষের ডালে লেজ জড়িয়ে নিচের দিকে ৪-৫ হাত মত ঝুলে আছে এবং ধীরে ধীরে দোল খাচ্ছে।

উদ্দেশ্য আর কিছুই নয় নিচ দিয়ে কোন প্রাণী চলাচলের সময় ঝাঁপিয়ে পড়ে সেটাকে কাবু করে গিলে ফেলা। সৌভাগ্য জনাব ইসরাইল খানের, হাসমত যদি ওদিকে লক্ষ্য না করত তবে মহা এক বিপদের সম্ভাবনা ছিল উনার জন্য। খান সাহেব একটু পিছনে এসে গুলি করে ওটাকে নিধন করেন।

অতঃপর তিনি মুরগির সন্ধানে আরও পশ্চিমে একটি জঙ্গলে ঢুকে পড়েন। পাহাড়ি শুকনা ঝরণার মধ্য দিয়ে এগুবার সময় একটি বালির চরের মত খালি জায়গা দিয়ে খুব আস্তে আস্তে জনাব খান এগুচ্ছিলেন। হঠাৎ দেখেন যে দুটি বাঘের বাচ্চা নির্বিঘ্নে এক স্থানে খেলা করছে। কাছাকাছি যে মানুষ এসে দাঁড়িয়ে আছে ওদিকে ভ্রুক্ষেপও করছে না। তখনই উনার ওস্তাদের শিক্ষার কথা মনে পড়ে যায় এবং স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন। কিছুক্ষণ খেলাধুলা করে বাচ্চাগুলো যখন ডান দিকে জঙ্গলে ঢুকে পড়ে তখন খুব ধীরে ঘাড় ফিরাতেই দেখেন অপলক দৃষ্টিতে বাচ্চাগুলোর মা ইসরাইল খান-এর দিকে তাকিয়ে আছে। বাচ্চাগুলো চলে যাওয়ার একটু পরই মা ওখান থেকে সরে পড়ে। ওস্তাদের উপদেশ পালন করে তিনি সে দিন রক্ষা পেয়েছিলেন।

৫। **নাপিতের বাঘ নিধন ঃ** চট্টগ্রাম বনাঞ্চলে একস্থান হ'তে অন্যস্থানে যাওয়ার বিশেষ করে দু'পাহাড়ের মধ্যবর্তী রাস্তাকে পাহাড়ি 'ঢালা' বলা হয়। এ রকম সাতকানিয়া, বাঁশখালি, অহরবাংগ, লামা, আলী কদম ইত্যাদি স্থানে যাতায়াতের অনেকগুলি পাহাড়ি ঢালা আছে। বেশ কিছু দিন আগের ঘটনা। বাঁশখালি অঞ্চলের একজন নাপিত সাতকানিয়ায় তার আত্মীয়ের বাড়িতে যাবে বলে একটি মোচা (কলা পাতায় পেঁচানো ভাত) নিয়ে ঢালার পথ ধরে যাত্রা শুরু করে। বলাবাহুল্য, তার চুলকাটার চামড়ার যন্ত্রের বাক্সটাও তার কাঁধে ঝুলানো ছিল। দুপুর নাগাদ মধ্য পথ পর্যন্ত এসে এক জায়গায় বসে মোচা ভাত খাওয়ার পর সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। চুলকাটার বাক্সটা মাথায় দিয়ে বিশ্রাম নিতে গিয়ে লোকটি বেমালুম ঘুমিয়ে পড়ে। এদিকে তার সমস্ত কার্যকলাপ উৎসুক দৃষ্টিতে অবলোকন করছিল জঙ্গলের একদল বানর।

গভীর ঘুমে নিমগ্ন অবস্থায় গাছের ডাল থেকে নেমে এসে কয়েকটি বানর খুব ধীরে ধীরে নাপিতের মাথার তলা থেকে চুলকাটার বাক্সটি বের করে নিয়ে এক লাফে উঁচু ডালে উঠে যায়। নিদ্রাভঙ্গের পরক্ষণে বেসামাল অবস্থায় বানরগুলোর থেকে সে বাক্সটা নিতে পারেনি। এরপর ওটা হাতে নিয়ে বানরগুলো নাপিতের সাথে বানরীয় কায়দায় ব্যঙ্গ করতে থাকে। হতভম্ব হয়ে চিন্তা করতে করতে একটা বুদ্ধি তার মাথায় আসে। গায়ের জামাটি খুলে একটা লাঠিতে বেঁধে সে বানরগুলোর দিকে ছুড়ে দেয়। তৎক্ষণাৎ চুলকাটার বাক্সটি ফেলে দিয়ে লাঠিতে বাঁধা কাপড়টি নিয়ে বানরগুলো একদিকে পালিয়ে যায়।

এরপর বেলা থাকতেই গন্তব্যে পৌছার লক্ষ্যে ওখান থেকে উঠে ঢালার পথ দিয়ে পুনরায় হাঁটতে আরম্ভ করে নাপিতটি। গীরিপথের মত দু'দিকে উঁচু

পাহাড়ের মাঝখানে শুকনা ঝরণার মধ্যবর্তী পথ ধরে সে একাকী হাঁটতেছিল। কিছুদূর যেতে না যেতেই পার্শ্ববর্তী ঝোপজঙ্গল হতে একটি মাঝারি আকারের বাঘ বেরিয়ে বিকট হুঙ্কার দিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই প্রথম ধাক্কায় পিছনের খাড়া পাহাড়ের সাথে নাপিতকে ঠেকিয়ে দেয় বাঘটি। পালিয়ে আত্মরক্ষা করার উপায় নেই, খাড়া অবস্থায় নাপিতের সাথে ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায় বাঘের সাথে। প্রথমে হাতে, পরে নাপিতের বাম কাঁধের উপর কামড় বসিয়ে দেয় বাঘ। এরূপ অসহায় অবস্থায় তার মনে পড়ে চামড়া দিয়ে তৈরি ক্ষুরের বাক্সটির কথা। তার কাঁধে তখনও ঝুলনো ছিল সেটি। ডান হাতটি কোন প্রকারে ছাড়িয়ে নিয়ে তীক্ষ্ণধার ক্ষুরটি নিয়ে সজোরে টান দেয় বাঘের পেটে। পর পর আরও দু'বার। আর যায় কোথায়। বের হয়ে পড়ে বাঘরে নাড়িভুঁড়ি। কিছুক্ষণের মধ্যে নিস্তেজ হয়ে নাপিতকে ছেড়ে দিয়ে পড়ে যায় বাঘটি। এভাবে রক্ষা পেয়ে যায় নাপিত এবং কিছুক্ষণ পর ঢালের পথে আসা অন্যান্য পথযাত্রীর সহায়তায় বাঘটি নিয়ে গ্রামে ফিরে যায় সে।

৬। **মাজারের নিকটে বাঘ ঃ** বার আউলিয়ার দেশ হিসেবে চট্টগ্রাম জেলা সুপ্রসিদ্ধ। জেলাটির বিভিন্ন এলাকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে সর্বজনবিদিত বহু আউলিয়া বুজর্গানের মাজার অবস্থিত। প্রায় সময় এ সব মাজারে বাঘসহ অনেক প্রকার বন্য প্রাণীর আগমন ঘটে। ঘটনাগুলি অবিশ্বাস্য হলেও বাস্তবে সত্য। অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হতে সন্দেহাতীতভাবে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাণীগুলো হয় ত বা উনাদের হয়ে বা অন্য কিছুতে আকৃষ্ট হয়ে এখানে আসে। প্রায় মাজারের নিকটবর্তী জঙ্গলাকীর্ণ যে জায়গা থাকে তাকে নিরাপদ স্থান মনে করেও মাজারের নিকটে আসতে পারে। এ সব বিতর্কের প্রয়োজন নেই। তবে মাজারে বন্য জীবজন্তুর আগমন একটি ধ্রুব সত্য বিষয়।

২-৩ বছর পূর্বে চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার প্রায় এক মাইল পূর্বে অবস্থিত শাহপীর আউলিয়ার মাজারে এসে একটি হাতি আটকা পড়ে। প্রায় ৫-৬ মাইল দূরবর্তী জঙ্গল/পাহাড় হতে আগের রাত্রে হাতিটি এসেছিল। সূর্যোদয়ের পূর্বে হাতিটি বাসস্থানে ফিরে যেতে পারবে না ভেবে হয় ত মাজারের পার্শ্ববর্তী ছোট একটি জঙ্গলে ঐ দিনের জন্য আশ্রয় নেয়। ওটার অস্তিত্ব স্থানীয় জনগণের নিকট আবিষ্কার হওয়ার পর এলাকাটি লোকে লোকারণ্য হয়ে ওঠে। স্থানীয় বয়োজ্যেষ্ঠ লোকজন এ উপচে পড়া ভিড় কোন রকমে সামাল দিয়ে হাতির থেকে লোকজনকে নিরাপদ দূরত্বে রাখেন। পরের রাত্রেই ওটা ওখান থেকে সরে পড়ে।

সম্প্রতি ২৮শে এপ্রিল, ২০০৪ দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার একটি খবর এখানে উদ্ধৃত করা হলো।

***পটিয়ায় একটি চিতা বাঘের করুণ মৃত্যু ঃ** পটিয়ার লোকালয়ে গভীর জঙ্গল থেকে তিনটি চিতা বাঘের নেমে আসা এবং ফিরে যাওয়ার সময় তাদের একটি*

ট্রাক চাপায় মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে দারুণ ঔৎসুক্যের সৃষ্টি হয়েছে। সোমবার মধ্য রাতে শাহচান্দ আউলিয়া (রহঃ) মাজার গেটের সামনে চট্টগ্রাম মহাসড়কে ওই বাঘটি নিহত হয়। মঙ্গলবার সারাদিন নিহত বাঘটি দেখার জন্য শত শত মানুষ ভিড় জমায়। শাহচান্দ আউলিয়ার মাজার নিয়ে অনেক পুরানো কিংবদন্তি এখনও মানুষ জনের প্রধান আলোচনার বিষয়। ট্রাক চাপায় নিহত চিতা বাঘটি লম্বায় ৪ ফুট হবে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান।

প্রত্যক্ষদর্শী এবং স্থানীয় সূত্রগুলো বলছে, বাঘ তিনটি সোমবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে সড়ক থেকে দু'শ গজ পশ্চিমে অবস্থিত পটিয়ার ঐতিহ্যবাহী হযরত শাহচান্দ আউলিয়ার (রহঃ) মাজার প্রাঙ্গণে অবস্থান করে। এরপর মাজারের চারদিক কয়েকবার প্রদক্ষিণ করে। মাজারের এতিমখানার কয়েকজন ছাত্র তা দেখে ভয়ে কুঁকড়ে যায়। মধ্য রাতে বাঘ তিনটি নিজের মতো করে ফিরে যাচ্ছিল। রাস্তা পার হওয়ার সময় চট্টগ্রাম অভিমুখী একটি ট্রাক একটি বাঘকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই সেটি মারা যায়। সঙ্গী অপর দুটি বাঘ ঘটনাস্থলে পাঁচ মিনিট অবস্থান করে এবং নিহত বাঘটিকে পরম মমতায় চেটেচুটে মানুষের সাড়া পেয়ে পাহাড়ের দিকে চলে যায়।

গতকাল সকালে নিহত চিতাটিকে মাদ্রাসার মাঠে এনে রাখা হলে সেখানে শতশত মানুষ ভিড় জমায়। দুপুরে মাজার সংলগ্ন এলাকায় বাঘটিকে মাটি চাপা দিয়ে দাফন করা হয়। মাজার কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয়রা বলছেন, মাজারে বহুদিন আগে থেকেই গভীর রাতে মাঝে-মধ্যেই বাঘ, হাতি, হরিণসহ নানা বন্যপ্রাণীর আগমন ঘটতো।

৭। হরিণ শিকারে বাঘ ঃ শিকার যখন নিষিদ্ধ ছিল না সে সময়ে চট্টগ্রাম বনাঞ্চলে অন্যান্য শিকারসহ হরিণ শিকার পেশাদার এবং সৌখিন শিকারিদের এক নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। তবে দক্ষিণ চট্টগ্রামের অনেকস্থানে হরিণ শিকারের ধরনটা ছিল ব্যতিক্রমধর্মী। শিকারের নিয়ম হল ঃ যে কোন জঙ্গলে/পাহাড়ে হরিণ আছে বলে নিশ্চিত হতে পারলে চারিদিক থেকে ওঠাকে ঘেরাও করা হয়। স্থানটিকে শিকারিদের ভাষায় 'বান্ধ' বলে। বান্ধের চারিদিকে যদি পাহাড়ি ঝরণা থাকে, ওগুলোর পার্শ্বে বালিতে কিম্বা চারিদিকের নরম মাটিতে জীবজন্তুর পায়ের ছাপ নিরীক্ষা করে বান্ধের স্থান নির্ধারণ করা হয়। বান্ধের মধ্যে তাড়া করলে যে দিকে হরিণ পালাবার সম্ভাবনা থাকে, সে দিকে প্রায় ৪০-৫০ গজ দূরত্বে বন্দুক নিয়ে একজন করে শিকারি অবস্থান নেয় এবং যতদূর সম্ভব ক্যামুফ্লেইজ করে বসে পড়ে। বান্ধের অপর দিকে বিটাররা নির্দিষ্ট একটি দূরত্ব বজায় রেখে জঙ্গলে ঢুকে পড়ে। অতঃপর সব বিটার এক সঙ্গে জঙ্গল পিটিয়ে হৈচৈ করে শিকার/হরিণ তাড়িয়ে নিয়ে আসে বন্দুকধারীদের দিকে।

বিটিং এর এই নিয়মে হরিণ শিকারের সময় যে সব শিকারি বন্দুক নিয়ে বসে, প্রকৃতপক্ষে তারাই সবচেয়ে দক্ষ এবং অভিজ্ঞ শিকারি। বিটারদের তাড়া খেয়ে

পলায়মান অবস্থায় যত দ্রুত গতিতে হরিণ দৌড়াক না কেন, শিকারিকে গুলি লাগাতেই হবে হরিণের গায়ে। কারণ হরিণ তাড়া করে নিয়ে আসা অনেক চেষ্টা এবং কষ্টের ফল। তাই গুলি মিস হলে, শিকারিকে সকলের ভর্ৎসনা ও গালমন্দ শুনতে হয়। অপরদিকে বিটারদের এবং অন্যান্য শিকারিদের অবস্থানের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে সাবধানে গুলি ছুড়তে হয়। এ ছাড়া গাভীন হরিণও শিকার করা যায় না। অনেক সময় বাঘ, ভালুক কিম্বা অন্যান্য হিংস্রপ্রাণী বান্‌ধের মধ্যে থাকে, যেগুলো শিকার প্রক্রিয়ায় অত্যন্ত সমস্যা করে। এ রকম কয়েকটি ঘটনা নিম্নে বর্ণিত হলো ঃ

(ক) দক্ষিণ চট্টগ্রামের আজিজ নগরের কাছাকাছি পার্বত্য চট্টগ্রামের ঘটনা। আমি (বই এর লেখক) তখন ছোট এবং অনভিজ্ঞ বলে আমার বন্দুক নিয়ে বসার সুযোগ ছিল না, তাই বিটারের দলের সদস্য হিসেবে শিকারে অংশগ্রহণ করেছিলাম। গহিন জঙ্গলের মধ্যে অতিকষ্টে অন্যান্যদের সাথে তালে তাল মিলিয়ে সামনের দিকে আমরা এগুচ্ছি। সাথে মামাদের আত্মীয় মে...হাসন সাহেবও ছিলেন। তিনিও বয়সে ছোট বলে বিটারদের সাথে ছিলেন। এক সময় বিটারদের মধ্যে একজন বলে উঠল "সামনে হরিণ আছে", সাথে সাথে কয়েকজন বলল "হরিণ যাচ্ছে হরিণ"। এ চিৎকার নাকি বন্দুকধারী শিকারিরাও শুনতে পেয়েছিল। আমিও লাল আবছা মত কি যেন একটা দেখতে পেয়েছিলাম।

বনলতা, কাঁটাঝোপ, উঁচু নিচু, খানা খন্দক ইত্যাদি পার হয়ে একটা দুটা করে পাহাড় ডিঙ্গিয়ে যাচ্ছে বিটারের দল। এ অবস্থায় এগিয়ে যাওয়া তাও দ্রুত গতিতে বর্ণনাতীত কষ্টদায়ক। তবুও এর মধ্যে চরম এক উত্তেজনা, এই বুঝি বন্দুকের আওয়াজ হবে, দেখব একটি হরিণ পড়ে আছে। এ অবস্থায় প্রায় ঘণ্টা খানেকের মধ্যে বন্দুকধারী শিকারিদের নিকটেই চলে এসেছি আমরা। হঠাৎ দেখি আমাদের সামনের বন্দুকধারী শিকারি গাছের উপর উঠে বসে আছে এবং ইশারা করছে যেন বড় করে শব্দ না করি। আরও কয়েকজন বন্দুকধারী শিকারিদের দেখি নিরাপদ স্থানে সরে পড়তে ভুল করেনি। অতঃপর একদিকে ইঙ্গিত করে দেখালো আমার সামনের বন্দুকধারী শিকারি। সে দিকে উঁকি দিয়ে দেখি একটি ডোরা কাটা বাঘ হেলে দুলে চলে যাচ্ছে। প্রথমে আমরা যেটা দেখেছিলাম সেটা হরিণ ছিল না, ছিল মাঝারি সাইজের একটি বাঘ।

(খ) চুনতি অভয়ারণ্যের অনারারি ওয়ার্ডেন জনাব লুৎফর রহমান ষাটের দশকের দিকে হাটহাজারির গহিন জঙ্গলে একদিন একটি বিটিং করা শিকারে অন্যান্য শিকারিদের পাশাপাশি বন্দুক নিয়ে বসেছিলেন। এক সময় উনার বসার স্থানে বন্দুকটি রেখে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে একটু দূরে গিয়ে বসেন। কিছুক্ষণ পর দেখেন একটি শিং ওয়ালা সুন্দর হরিণ এসে বন্দুকের লাল কাঠের অংশটি জিহ্বা দিয়ে চাটছে। তিনি মন্তব্য করেছিলেন সঙ্গে একটি ক্যামেরা থাকলে "এ

অপরূপ দৃশ্য ধারণ করে রাখা যেত।" অবশ্য ঐ অবস্থায় তার আর কিছুই করার ছিল না।

অন্য একদিন এ রকম এক বিটিং করা শিকারের ঘটনা। কলউজানের পূর্ব দিকের দু'পাহাড়ের মধ্যে গিরিখাদের মত এক জায়গায় জড়োসড়ো হয়ে ক্যামুফ্লেজ করে হরিণের অপেক্ষায় তিনি বসেছিলেন। সাথে অন্য একজন দক্ষ প্রবীণ শিকারিও ছিল। হরিণ আসার জন্য তারা অপেক্ষায় ছিলেন। বিটিং এর সময় চকিত হয়ে যে দিক থেকে হরিণ বের হয়ে এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে যাবে বলে ধারণা করা হয়েছিল সে দিকে দেখেন একটি বিরাট বাঘ মাথা বের করে অবাক বিস্ময়ে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। পিছনে মানব জাতির হৈচৈ সামনেও কেন এরা ঘাপটি মেরে বসে আছে, এ সব বোধ হয় ভাবছিল বাঘটি। এমতাবস্থায় জনাব লুৎফর রহমান ও তার সঙ্গীর ভাগ্য সম্পূর্ণ বাঘটির অনুকম্পার উপর নির্ভর করছিল। তাদের করণীয় ঐ মুহূর্তে কিছুই ছিল না। তবে পিছন দিকে বিটারদের হৈ-হল্লায় হয় ত বিচলিত হয়ে দ্রুত ওখান থেকে এক লাফ দিয়ে বাঘটি পালিয়ে যায়।

(গ) ষাটের দশকের শেষের দিকে কলেজ ছুটির অবসরে গ্রামের বাড়ি চুনতিতে বেশ আমোদের মধ্যে আমার (বই এর লেখক) দিন কাটছিল। জ্যৈষ্ঠ মাসের এক দুপুরবেলায় আমরা কয়জন (আমি, জুনু মিঞা, আমাদের ভাতিজা সাবু–যে কিছু দিন পূর্বে নির্মমভাবে সৌদি আরবে মৃত্যুবরণ করেছে এবং দায়েম) গ্রামের নিকটবর্তী জঙ্গলের দিকে রওনা হই। উদ্দেশ্য ছিল জঙ্গলে মনের আনন্দে একটু বেড়িয়ে আসা এবং সুযোগ হলে বন মোরগ শিকার করা। এর ফাঁকে বৃষ্টি ভেজা মাটিতে হরিণের পায়ের ছাপ দেখা যায় কিনা তাও দেখার পরিকল্পনা ছিল, যাতে করে পরদিন শিকারের আয়োজন করা যায়।

গ্রাম হতে প্রায় দু'মাইল দূরে জঙ্গলের মধ্যে মনের আনন্দে গল্প করতে করতে আমরা একসাথে হাঁটছিলাম। হঠাৎ শুনি দূরে কে যেন চিৎকার করে বলছে "গরু বাঘে ধরেছে"। কাছে গিয়ে দেখি আমাদের পাড়ার আব্দুল গনি নামক একজন কৃষক। ঐ জঙ্গলের পাশেই সে জমি চাষ করত। সে তার গরু বাঘে ধরেছে বলে চিৎকার করছিল। আমরা অকুস্থলে পৌছে দেখি তার একটি লাল বলদ হত্যা করে জঙ্গলের এক স্থানে দৃষ্টির অগোচরে রেখে বাঘটি কোথায় লুকিয়ে গেছে। ততক্ষণে বেলা প্রায় চারটার মত গড়িয়ে গেছে। বিলম্ব না করেই দ্রুত গাছপালা কেটে আমরা মাচা তৈয়ার করে নিলাম এবং যতদূর সম্ভব সবাই মিলে লতা পাতা দিয়ে ক্যামুফ্লেজ করে নিলাম মাচাটাকে। আমরা সূর্য ডোবার সময়ে আধ ঘণ্টার মত মাচায় বাঘের পাহারায় বসেছিলাম। তবে গাছ কাটার শব্দ বোধ হয় বাঘটি শুনতে পেয়েছিল তাই মড়ির ধারেকাছেও আসেনি সহসা। অতঃপর জুনু মিঞা এবং সাবুকে বাঘ শিকারের সুযোগ দেয়া হল। মাচায় বাঘ শিকারের সময় নাকি

ধূম পান করা নিষেধ। জুনু মিঞা মাত্র তিন পেকেট সিগারেট ও দুটা ম্যাচ নিয়ে মাচায় উঠেছিল। ইতোমধ্যে গ্রামের প্রবীণ শিকারি আমির হোসেন এবং মোস্তাককে খবর দেয়া হয়েছিল। তারা ৭.৩০-এর দিকে মাচার নিকট পৌছে যায়। তাদের মাচায় বসার ঘন্টা খানেকের মধ্যে মাঝারি আকারের বাঘটি মারা পড়ে।

(ঘ) পাকিস্তান আমলের শেষের দিকে দক্ষিণ চট্টগ্রামের বনাঞ্চলে বিশেষ করে আরাকান বেড়ের পশ্চিম পার্শ্বে প্রায়ই বাঘ দেখা যেত। ঐ সময়ে হরিণ শিকারের একটি দল দোছাইল্ল্যার পাহাড়ে হরিণ শিকার করতে গিয়ে বিফল হয়ে ফিরে আসছিল। পথিমধ্যে তাদের রাত হয়ে যায়। জঙ্গলের অভ্যন্তরে একটি শুকনা ঝরণার পথ ধরে তারা গ্রামের দিকে ফিরছিল। শিকারি দলের মধ্যে ছিলেন প্রবীণ শিকারি রশিদ উল্লা খান এবং সামনে ছিল দক্ষ শিকারি ছলিম উল্লা। এছাড়াও উক্ত দলের মধ্যে সাত-আট জনের মত বিটারও ছিল। শিকারি দলটি প্রায় আধ ঘন্টা ধরে জোৎস্না রাতে ঝরণার মধ্যবর্তী পথ ধরে হেঁটে আসছিল।

এখানে উপরিউক্ত শিকারিদ্বয়ের বিটিং শিকারের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। জনাব রশিদ উল্লা খান ১৯ বছর বয়সে ছাত্র জীবনে বিটিং করা এক শিকারে ৯ মণ ওজনের এক সাম্বার শিকার করে বিরল কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছিলেন। ১৯৫০ এর দিকে বিটিং করা শিকারে অনভিজ্ঞ এবং বয়সে ছোট বলে হরিণ আসার সম্ভাবনাহীন ফাঁকা এক জায়গায় বন্দুক নিয়ে ওনাকে বসতে দেয়া হয়েছিল। উনার বর্ণনা মতে বিটিং করা শুরু হওয়ার পরক্ষণে দেখেন ছোট ছাগলের সমান কি যেন একটা জন্তু অনেক দূর থেকে দ্রুত গতিতে উনার দিকে আসছে। একটু পর পর জন্তুটাকে বড় দেখাচ্ছিল। কাছে আসতেই দেখেন ওটা একটা বিরাট সাম্বার হরিণ। উনার বন্দুকের একটাতে লঙ্গ রেঞ্জ এলেজি, অপরটাতে বুলেট ভর্তি ছিল। উনার চাচা কবিরুদ্দিন আহমদ খানের একটি উপদেশ তাঁর নাকি মনে পড়ে যায়। চাচা বলেছিলেন, বড় জন্তুকে কার্যকরী শট করতে হলে যে কোন গুলির বদলে বুলেট মারাই উত্তম। তিনি বন্দুকের যে নলে বুলেট আছে হরিণটাকে সই করে সেটার ট্রিগারে টান দেন। ফায়ার করার পর গুলিবিদ্ধ হয়ে হরিণটা উনাকে ডিঙ্গিয়ে চলে যায়। তিনি পিছনে ফিরে নিচের দিকে লক্ষ্য না করে দৌড় দিতেই হোঁচট খেয়ে ওটার গায়ের উপর পড়ে যান। এর মধ্যে শিকারি সঙ্গীরা এসে উনাকে বাহবা দিতে থাকেন। তখন থেকেই দক্ষ শিকারির খাতায় উনার নাম ওঠে। এরপর অনেক বছর ধরে তিনি চট্টগ্রাম এলাকায় শিকার করেছেন। উক্ত শিকারি দলের অপর একজন শিকারি ছলিমুল্লার শিকারি জীবনও ছিল এক কাহিনী সমতুল্য। তার নিজের ভাষ্য মতে তিনি প্রায় সাত শতের মত ছোট হরিণ এবং ২০টিরও বেশি বড় হরিণ শিকার করেছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালেটিতে চাকরি করতেন।

পূর্বের ঘটনায় আসা যাক। ঝরণার থেকে উঠে আসার পূর্ব মুহূর্তে শিকারি দলটি একটি বাঁক পার হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে আসতেই দেখে বিরাট একটি বাঘ তাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। বাঘ দেখে ছলিমুল্লাহ এর পাশের বিটার লোকটির মুখ দিয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে অ-অ-অ করে সজোরে এমন এক অদ্ভুত বিকট শব্দ বের হতে থাকে- যা শুনে বাঘটিও ঘাবড়িয়ে যায়। পাহাড় পর্বত একাকার করে জঙ্গল এর উপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে অনেক দূরে চলে যায় বাঘটি। ছলিমুল্লাহ বর্ণনা দিয়েছিলেন এভাবে বাঘ মানুষকে ভয় পেতে সে জীবনেও দেখেনি। (সে যা হোক, ছলিমুল্লাদের মত সকল শিকারিদের বর্তমানে একই প্রশ্ন বিগত ৩-৪ দশক পূর্বের জঙ্গলের সৌন্দর্য এবং জীবজন্তুর দিন আর কি কোন দিন ফিরে আসবে না?)

৮। হিমছড়ির বড় বাইঘ্যা (বাঘ) ঃ পঞ্চাশ দশকের দিকে প্রায় ৭-৮ বছর ধরে দক্ষিণ চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চল হিমছড়ি, গজালিয়া, সোনাছড়ি, দোছাইল্ল্যা ইত্যাদির প্রায় ১৫-২০ মাইল এলাকা জুড়ে দাপটের সাথে বিচরণ করে আসছিল একটি বৃহৎ আকারের বাঘ, যেটাকে এলাকার লোকজন হিমছড়ির "বড় বাইঘ্যা" নামে আখ্যায়িত করেছিল। এ রয়েল বেঙ্গল টাইগারটি বহুবার লোকজনের সামনা-সামনি হয়েছিল তবে মানব জাতির সাথে তার যে কোন প্রকার শত্রুতা নাই তা সে প্রমাণ করে আসছিল, বহুবার বহুক্ষণে। ভুলেও ওটা কোন দিন জনগণকে আক্রমণ করেনি। যতদূর সম্ভব মানব জাতিকে এড়িয়ে চলত বাঘটি।

বাঘটি ছিল এক অদ্ভুত স্বভাবের। শীতর রাত্রে প্রচণ্ড শীতে বেসামাল হয়ে প্রায় লোকালয়ের কাছে চলে আসত এবং হুঙ্কার দিতে থাকত। অত্র এলাকায় মেয়েরা "হিমছড়ির বড় বাইঘ্যা, আইলরে আইল" (আসল রে আসল) বলে বাচ্চাদের ঘুমপাড়ানি গান শুনাত বলেও প্রবাদ আছে। তবে মাঝে মধ্যে গৃহস্থের গোয়ালের বড় বলদটা মেরে কাঁধে করে নিয়ে যেতেও কুণ্ঠাবোধ করত না। বাঘটির দাপটে কোন মদ্দা বাঘ ওটার এলাকায় থাকত না। যে কোন মদ্দা বাঘ পারতপক্ষে ওটাকে এড়িয়ে চলত বরং এ বড় বাঘটির নির্ধারিত স্থানে বিবাদ না করে দূরবর্তী কোন স্থানে চলে যেত। বাঘটির কয়েকটি ঘটনার বর্ণনা এখানে দেয়া হল ঃ

(ক) জনৈক বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি এনায়েত আলী (মোয়াজ্জিন) তার সঙ্গী সৈয়দ উল্লার সাথে পাহাড়ি মধু অনুসন্ধানে একদিন সোনাছড়ি নামক স্থানের গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করে। তারা দু'জন খাঁ খাঁ করা রোদের মধ্যে একটি পাহাড়ি ঝরণার পাশ দিয়ে হাঁটছিল। জঙ্গলের অভ্যন্তরে মৌমাছি দেখা যায় কিনা তা লক্ষ্য করতে করতে তারা সামনের দিকে এগুচ্ছিল। তাদের দু'জনের হাতে দুটি মাত্র দা-ই ছিল সম্বল। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বেশ কিছুদূর এগুবার পর তাদের সামনে এক জায়গায় গাছের ছায়ায় দেখতে পায় অঘোর ঘুমে ঘুমাচ্ছে একটি বৃহৎ আকারের বাঘ। বাঘ

দেখেই তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। একটু চিন্তা করে দু'জনেই খুবই সন্তর্পণে কাছাকাছি একটি গাছের উপর উঠে যায়। অতঃপর তাদের হাতের দায়ের উল্টা দিকে সজোরে আঘাত করলে ঠন্ করে একটি শব্দ হয়। সাথে সাথে বাঘটি উঠে দাঁড়ায় এবং আড়মোড়া খেতে থাকে। এনায়েত আলী মোয়াজ্জিন চাচার ভাষায় "তখন মনে হচ্ছিল মাঝারি আকারের একটি ডোরাকাটা হলুদ ঘোড়া যেন আড়মোড়া খাচ্ছে।" দ্বিতীয় বার ওরকম শব্দ করার সাথে সাথে বনজঙ্গল একাকার করে বাঘটি একদিকে দৌড় দেয়। বোঝা যাচ্ছিল জঙ্গলের অভ্যন্তরে অস্বাভাবিক কোন শব্দ কি ভাবে হিমছড়ির এ বড় বাঘটিকে বিচলিত করে তুলতে পারে।

(খ) তদানীন্তন গভঃ হাইস্কুলের হেড মাস্টার চুনতি মোনসেফ বাড়ির জনাব মন্তসরুল ইসলাম এক রাত্রে সাইকেলে চড়ে খামারবাড়ির উদ্দেশে রওনা দেন। খামারবাড়ির কাজ তদারকি করা ছাড়াও ভোরবেলা বন মোরগ শিকারের ইচ্ছা ছিল উনার। সাইকেলে চড়ে আরকান রোড ধরে জঙ্গল বস্থি (জাহাইল্ল্যা) নামক স্থানে তিনি পৌছেন ভোর চারটার দিকে। আরকান রোডের ঐ স্থানের জায়গাটি উঁচু পাহাড় থেকে খাড়া দক্ষিণ দিকে নেমে গেছে। ঢালু রাস্তায় দ্রুত গতিতে সাইকেল নামছিল, তখনই দেখতে পান গরুর সমান কি যেন একটা শুয়ে আছে রাস্তার উপর। সাইকেল আরোহীর গতি লক্ষ্য করে এক লাফে উঠে সামনের দিকে দৌড়াতে থাকে জন্তুটি। সামনে জন্তুটি দৌড়াচ্ছে পিছনে সাইকেল আরোহী প্রায় দু' থেকে আড়াইশ গজ আরকান রোডের রাস্তা ধরে এভাবে যাওয়ার পর একদিকে লাফ দিয়ে সরে পড়ে জন্তুটি। ওটা ছিল হিমছড়ির বড় বাইঘ্যা।

(গ) দক্ষিণ চট্টগ্রামের গজালিয়া নামক পাহাড়ি এলাকায় একদিন এক বিশাল হালের বলদ হত্যা করে এ বাঘটি। চাষীদের সম্মুখেই কুলিদের চালের বস্তা বহন করার মত করে বলদটি কাঁদে করে জঙ্গলে ঢুকে পড়ে বাঘ। গরুর মালিক দৌড়ে গিয়ে গ্রামে লোকজনকে এ খবর জানায়। তদানীন্তন চুনতি গ্রামের জনৈক ইব্রাহিম নামের তুখোড় শিকারিকে খবরটি দেয়া হয়। এক গুলিতে দুটি বড় হরিণ মারার মত শিকারি হিসেবে দুর্লভ গৌরবের অদিকারী ছিলেন ইব্রাহীম। সময়মত তারা ঘটনাস্থলে পৌছে যান। আর একজন শিকারি ও একজন সঙ্গীসহ বাঘটি ট্রেইস করতে করতে তারা প্রায় এক মাইল পর্যন্ত গহিন জঙ্গলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েন। অতঃপর এক জায়গায় দেখতে পান তিন দিক উঁচু পাহাড়ে ঘেরা জঙ্গলের একটি খালি জায়গায় আস্ত গরুটি রেখে বাঘ কোথায় যেন চলে গেছে। মড়িটা বাঁশের রশি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে বরাবর উপরে পাহাড়ের ঢালুতে একটি মাচা তৈয়ার করা হয়। মাচার চারিদিক গহিন ঝোপজঙ্গলে ঘেরা ছিল বলে ধারণা করা হচ্ছিল, বাঘটি মাচা দেখতে পাবে না। মাচা তৈরির লোকজন পাঠিয়ে দিয়ে তারা সূর্য ডোবার পূর্বেই মাচায় বসে পড়েন।

সূর্য ডোবার পর পর তিনজনই জড়োসড়ো হয়ে খুব সাবধান হয়ে যান। সবারই সামনের দিকে দৃষ্টি। একটু পরেই পিছনে ক্ষীণ খস খস ইঁদুর নড়াচড়া করার মত একটি শব্দ ইব্রাহীমের শ্রবণ শক্তিকে ফাঁকি দিতে পারেনি। ইব্রাহীম খুব সন্তর্পণে পিছন দিকে তাকাতেই দেখে প্রায় ১৫-২০ ফুট দূরত্বের মধ্যে দু'পায়ের উপর ভর দিয়ে তাদের দিকে অপলকদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বৃহৎ এক রয়েল বেঙ্গল টাইগার। এ অবস্থায় সম্পূর্ণ বাঘটির ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর তাদের ভাগ্য বুঝতে পেরে ইব্রাহীম ধীর গতিতে মাথা গুটিয়ে নেয়। হৈচৈ বা নড়াচড়া করলে সবার জন্য মহা এক বিপদ হতে পারে মনে করে সঙ্গীদের কিছুই বুঝতে দেয়নি ইব্রাহীম।

পরক্ষণে নিঃশব্দে বাঘটি মড়িটির কাছে চলে যায় এবং ওটাকে কাঁধের উপর নিয়ে সজোরে একটা হেঁচকা টান দেয়। মড়িটি যে গাছটির সাথে বাঁধা ছিল গোড়া সহ সেটি উপড়ে যায়। গাছসহ গরুটি টানতে টানতে একদিকে নিয়ে যায় বাঘ। ইব্রাহীমের সঙ্গীরা গুলি ছুড়তে চেষ্টা করছিল কিন্তু ইব্রাহীম সঙ্গীদের বারণ করেন। কারণ এতে বাঘটি তো মারা যাবেই না বরং নিজেদের জীবনও বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল বেশি। বাঘটি ছিল সেই হিমছড়ির বড় বাইঘ্যা।

(ঘ) পৌষ/মাঘ মাসে প্রচণ্ড শীতের সময় রাত্রে খামারবাড়িতে বাইরে আগুন জ্বালিয়ে বেশ কিছুক্ষণ শীত নিবারণ করে খামারের বাড়িতে ঢুকত এক চাষী পরিবার। খামারটি ছিল সাপমারা নামক একটি পাহাড়ি স্থানে। এ চাষী পরিবার চাষাবাদের জন্য বছরের বেশ কিছুকাল ঐ অঞ্চলে থাকত। গভীর রাত্রে ঐ আগুনের কাছে বাঘটি প্রায় চলে আসত যা ওটার পায়ের ছাপ দেখে তারা বুঝতে পারত। খামারের অভ্যন্তরে বসে রাত্রে বন্দুক দিয়ে বাঘটি মারার জন্য তারা একবার একজন শিকারিকে নিয়ে পরিকল্পনা করে। তদনুযায়ী তারা একটি বাঁশের পাটাতন (মাচা) তৈয়ার করে খামারের অভ্যন্তরে, যার উপরে বসে মাটির ঘরের একটি ছিদ্র দিয়ে জায়গাটি ভালমতো দেখার ব্যবস্থা ছিল। এক রাত্রে বাইরে আগুন জ্বালিয়ে কিছুক্ষণ শীত নিবারণ করার পর খামারের অভ্যন্তরে পাটাতনের উপর একজন বন্দুকধারী শিকারিসহ বাড়ির মালিক বাঘটির জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। গভীর রাত্রে আগুনের কাছে বাঘটি আসতে না আসতেই শিকারি একটু নড়াচড়া করে এবং পাটাতনের বাঁশের শব্দ হয়। মুহূর্তের মধ্যে লাফ দিয়ে বাঘটি জঙ্গলে ঢুকে পড়ে। অতঃপর ভুবন কাঁপানো হিমশীতল করা হুঙ্কার দিতে থাকে। এরপর আর কোন দিন তাদের আগুনের কাছে বাঘটি আসেনি। বহুদিন যাবৎ নির্দিষ্ট এলাকায় দাপটের সাথে চলাফেরা করতে থাকে বাঘটি। অতঃপর এক সময় বাঘটি হারিয়ে যায়। অতবড় রয়েল বেঙ্গল টাইগার ঐ এলাকায় আর দেখা যায়নি।

(এখন শিকারিদের এবং এলাকার লোকজনের প্রশ্ন এ অঞ্চলে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, বনজঙ্গলের পরিবেশ এবং জঙ্গলের পশু পক্ষীর প্রাচুর্য কি আর কোন দিন ফিরে আসবে না?)

চুনতি অভয়ারণ্যের ইতিকথা এবং চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চলের অবস্থা

(ক) চুনতি অভয়ারণ্যের ইতিকথা ঃ চট্টগ্রাম শহর থেকে প্রায় ৩৪ মাইল দক্ষিণে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের পশ্চিম পার্শ্বে ১৯৮৬ সাল এক সরকারি গেজেটের মাধ্যমে চুনতি অভয়ারণ্যটি স্থাপন করা হয়। লোহাগাড়া, সাতকানিয়া এবং বাঁশখালি–এ তিন উপজেলার মধ্যবর্তী স্থানে ১৯,১৭৭ একর বনভূমি অভয়ারণ্যের জন্য আদর্শস্থান হিসেবে সঙ্গত কারণেই চিহ্নিত করা হয়েছিল। স্থানটিতে খাড়া আকাশচুম্বী পর্বতরাশি ছাড়াও গভীর জঙ্গল, পাহাড়ি নদী, ঝরণাধারা এবং জঙ্গলের প্রাকৃতিক সব রকম পরিবেশ বিদ্যমান ছিল বলে যথাযথ কারণে এলাকাটিকে উপযুক্ত স্থান হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছিল অভয়ারণ্যের জন্য। প্রাপ্ত তথ্য হতে জানা যায় আজ থেকে প্রায় দেড় দশক পূর্বেও পঞ্চাশটির মত হাতি, তিনশটিরও বেশি বিভিন্ন প্রকার হরিণ, দু'শটিরও বেশি বন্য ছাগল, দশ থেকে বিশটির মত নানান জাতের বাঘ, বানর, হনুমান, বিভিন্ন প্রজাতির সাপ, বন মোরগ, মথুরা এবং নানান ধরনের পাখির আবাসস্থল ছিল এ অঞ্চল।

গত দেড় দশকের মধ্যে অবহেলা, স্বার্থান্বেষী মহলের নির্বিচারে বন উজাড়, অভয়ারণ্যের মধ্যে বসতি স্থাপন ইত্যাদি কারণে অভয়ারণ্যটি বর্তমানে ধ্বংসের পথ দেখতে বসেছে এবং পশুপক্ষীর অবস্থান ও অস্তিত্ব অভয়ারণ্য থেকে বিলুপ্ত হতে যাচ্ছে। ওদিকে এর পার্শ্ববর্তী স্থানীয় বাসিন্দাদের এক বৃহৎ জনগোষ্ঠী বিরোধিতা করে আসছে অভয়ারণ্যটির। তাদের ধারণা এটা মোটেই উপযুক্ত স্থান নয় অভয়ারণ্যের জন্য। কারণ অভয়ারণ্য অধ্যুষিত এলাকার চতুষ্পার্শ্বে অত্যন্ত ঘন জন-বসতি আছে। এতদ্ব্যতীত এর অভ্যন্তরে প্রাইভেট মালিকানাধীন জমি ও বাড়ি-ঘর বিদ্যমান আছে অনেক কাল ধরে।

অভয়ারণ্যটির কারণে এস্থানে জনগণের চাষাবাদের ফসল পশুপক্ষীদ্বারা দারুণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বর্তমানে এর অভ্যন্তরে বিস্তর আবাদি জমি হাতির উপদ্রবের কারণে বিনা চাষে খালি পড়ে আছে। বলাবাহুল্য অভয়ারণ্যের মধ্যে সকল প্রকার বন্যপ্রাণীর অস্তিত্ব বিলোপ পেতে থাকলেও হাতির অবস্থান দিন দিন বেড়েই চলেছে। হাতি এবং শূকর দ্বারা জমির ধান যে শুধু নষ্ট হচ্ছে তা নয়, বরং চাষকৃত জমি হতে শত শত কৃষক খালি হাতে ফিরে আসতে বাধ্য হচ্ছে। তাদের অনেক চাষযোগ্য জমিও বন্য হাতির ভয়ে খালি পড়ে আছে। এছাড়া প্রতি বছর বন্য হাতি বহু নিরীহ কৃষক, পথিক এবং সাধারণ জনগণকে নির্মমভাবে হত্যা করে যাচ্ছে অভয়ারণ্য অধ্যুষিত এলাকায়।

অপরদিকে এ এলাকায় অভয়ারণ্য স্থাপনের পূর্বেকার ঘটনাপ্রবাহ পর্যালোচনা করলে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে অযৌক্তিকভাবে এখানে অভয়ারণ্য চাপিয়ে দেয়া হয়নি, বরং অত্র এলাকার কিছু দূরদর্শী ব্যক্তিবর্গের সুচিন্তিত উদ্যোগের ফসল এ অভয়ারণ্য। এর ধারণা সর্ব প্রথম জাগ্রত হয় এলাকার বেশ কিছু প্রবীণ লোকদের মধ্যে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নানাবিধ কারণে যখন শিকার দুষ্প্রাপ্যতার আশঙ্কা দেখা দেয়, তখন রিজার্ভ ফরেস্ট এর ন্যায় কিছু এলাকা নির্ধারণ করে বন্য প্রাণী সংরক্ষণের জন্যে স্থানীয় উদ্যোগী লোকজন তৎপর হয়ে ওঠেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের ন্যায় চট্টগ্রামের যাতায়াত ব্যবস্থাও অত্যন্ত অনুন্নত ও দুর্গম ছিল। বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে যোগাযোগ এবং রাস্তাঘাট উন্নয়নের সাথে সাথে প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসতি বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং অনেক সৌখীন শিকারিদেরও আবির্ভাব ঘটতে থাকে। ঐ সময়ে এলাকার কিছু প্রবীণ ব্যক্তিবর্গ চট্টগ্রাম-কক্সবাজারের মধ্যবর্তী, "জঙ্গল বস্তি" নামক একটি ঢালু জায়গায় বাৎসরিক শিকার বনাম পিকনিক করার লক্ষ্যে একত্রিত হতেন। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ইলিশিয়ার মোক্তার মিঞা, হারবাং এর হামিদ খান, চকোরিয়ার সৈয়দ মিঞা (তিন জনই স্ব স্ব এলাকার তদানীন্তন নামিদামি জমিদার), চুনতির কবিরউদ্দিন আহমদ খান (ব্রিটিশ সরকারের ডেপুটি মেজিস্ট্রেট), সৈয়দ হাজি (চুনতির মরহুম শাহ সাহেবের পিতা), চুনতির তাদনীন্তন চেয়ারম্যান ইলিয়াছ মিঞা এবং লোহাগড়ার তৈয়ব উল্লা সওদাগর প্রমুখ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালে তারা উপলব্ধি করতে পারেন যে অতি দ্রুত শিকার এ অঞ্চলে ফুরিয়ে যাচ্ছে। তারা এ বনভূমিটাকে "রিজার্ভ ফরেস্ট" জাতীয় বনাঞ্চল ঘোষণা করে শিকার নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব করেছিলেন সর্বপ্রথম।

পরবর্তীকালে চুনতির বাসিন্দাগণের মধ্যে কিছু ব্যক্তিবর্গ যেমন তদানীন্তন পাকিস্তান পরিকল্পনা কমিশনের সুখ্যাত অর্থনীতিবিদ প্রফেসার হাবিবুর রহমান, বুলবুল চৌধুরী (বিখ্যাত নৃত্য শিল্পী), ইসরাইল খান (সরকারি কর্মকর্তা), আইয়ুব খান, মনতাছিরুল ইসলাম (স্কুল হেড মাস্টারদ্বয়), লুৎফর রহমান, সাতকানিয়ার আতিকুর রহমান (সরকারি কর্মকর্তা) এবং রশিদ উল্লা খান প্রমুখ রিজার্ভ ফরেস্ট অথবা অভয়ারণ্য স্থাপনের ব্যাপারে উৎসাহী হন। তাদের মধ্যে অনেকের বৈধ শিকারের লাইসেন্স নিয়ে শিকার করার নেশাও ছিল। পঞ্চাশ দশকের শেষে ও ষাট দশকের প্রথমদিকে প্রফেসার হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে চুনতি ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বহুলোক বাৎসরিক একবার করে শিকার করতে যেতেন। তখন তিনি অচিরে বন্য প্রাণী বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কায় জনগণকে পশুপক্ষীর অভয়ারণ্য স্থাপনের জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। তার ছোট ভাই জনাব লুৎফর রহমান (অভয়রাণ্যের প্রথম অবৈতনিক ওয়ার্ডেন) বন বিভাগের সরকারি কর্মকর্তাদের

সহায়তায় এ বিষয়ে অনেকদিন ধরে প্রচার কার্য চালাতে থাকেন। ঐ সময়ে অত্র এলাকায় সমবায় এর উদ্যোক্তা হিসেবে সমবায় কার্যক্রমের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিও তাকে অভয়ারণ্যের বিষয়ে সহায়তা করেছিলেন।

ইতোমধ্যে প্রায় দেড় থেকে দু'যুগ অতিক্রান্ত হয়ে যায়। এর মধ্যে উক্ত স্থানের জঙ্গলে পশুপক্ষী দারুণভাবে হ্রাস পেতে থাকে। ১৯৭০ এর দিকে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রাক্কালে প্রশাসন দুর্বল হওয়ার কারণে দেশের বিভিন্ন স্থানের জঙ্গলে অকাতরে বন্য প্রাণী নিধন করা হয় এবং গাছকাটাও চলতে থাকে। চট্টগ্রাম অঞ্চলেও এর প্রভাব পড়েছিল ঐ সময়ে। স্বাধীনতাউত্তর কালে অভয়ারণ্য স্থাপনের উদ্যোগ স্থগিত থাকলেও পরবর্তীকালে এলাকার অনেক বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গ অভয়ারণ্য স্থাপন এবং জঙ্গল ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের লক্ষ্যে এগিয়ে আসেন। তাদের মধ্যে ছিলেন অভয়ারণ্যের সর্ব প্রথম ওয়ার্ডেন জনাব লুৎফর রহমান, প্রফেসার মরহুম হাবিবুর রহমান এর দু'ছেলে বাংলাদেশ বিমানের ক্যাপটেন আহমদ এবং অর্থনীতিবিদ ডঃ সোলতান হাফিজ রহমান (বর্তমানে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকে কর্মরত), এলাকার কয়েকজন প্রবীণ ব্যক্তি ও মেম্বার যেমন, জনাব আহমদ কবির, জনাব ফয়েজ আহমদ, জনাব কবির আহমদ (তিন জনই সওদাগর), মুবিনুল ইসলাম (ব্যাংকার), এ বই এর লেখক (নিজে) এবং অন্যান্য কিছু ব্যক্তিবর্গ। সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে যারা সর্বাঙ্গীন সহযোগিতা করেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন তৎকালীন অতিরিক্ত সচিব জনাব এসএম মাহমুদ, সিসি এফ জনাব মতিয়ুর রহামন, জনাব রওশন আলী, জনাব আলী আকবর ভূঞা এবং জনাব কাতেবী প্রমুখ। এদের সমষ্টিগত প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে ১৯৮৬ সালে এ অভয়ারণ্যটি স্থাপিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের প্রচেষ্টা এবং আইন বহুকাল থেকে প্রচলিত থাকলেও সত্তর দশকের পর হতে বন্য পশুপক্ষী সংরক্ষণের জন্য পৃথিবী জুড়ে অভূতপূর্ব সাড়া জাগে। উন্নত ও অনুন্নত দেশসমূহ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো উক্ত সময়কাল হতে এ লক্ষ্যে তৎপর হয়ে ওঠে। ফলে পাক-ভারত ও বাংলাদেশে অর্থাৎ দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে অভয়ারণ্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে বহু সরকারি এবং বেসরকারি অভয়ারণ্য স্থাপিত হয়।

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে এটা অবলীলায় বলা যায় যে, চুনতি অভয়ারণ্যটি যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া আকস্মিকভাবে এ অঞ্চলে স্থাপিত হয়নি। অথচ এর পার্শ্ববর্তী এলাকার বেশ কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ এটার প্রতি তাচ্ছিল্য ও বিরোধিতা করে আসছে। ওদিকে কর্তৃপক্ষ এবং দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের অযত্ন এবং অবহেলার ফলে অভয়ারণ্যটি বর্তমানে ধ্বংসের দোড়গোড়ায় পৌছে গেছে। এর অভ্যন্তরে হাতি ব্যতীত সব বন্য প্রাণীর অস্তিত্ব এখন বিলুপ্তির পথে। পূর্বেই বলা হয়েছে নির্বিচারে বনাঞ্চল কেটে উজাড়, অভয়ারণ্যের মধ্যে বসতি

স্থাপন, চোরা শিকারিদের উপদ্রব, এটার অভ্যন্তরে ও আশেপাশে ইটের ভাটা স্থাপন ইত্যাদি এটার ধ্বংস আরও তরান্বিত করছে। যদিও দেশের ১৯৭৪ ইং এর বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের আইনের ২৩(২) ধারায় বর্ণিত আছে "কোন বক্তি জঙ্গলের জীব জন্তুর জন্য স্থাপিত অভয়ারণ্যের অভ্যন্তরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করতে পারবে না, অভয়ারণ্যের মধ্যে বসবাস এবং চাষাবাদ করা যাবে না, গাছপালার ক্ষতি করা যাবে না এবং প্রাণী হত্যা করা যাবে না ইত্যাদি।" কিন্তু এ সবের তোয়াক্কাও কেউ করছে বলে মনে হয় না এ স্থানে।

অভয়ারণ্যের প্রতি অনেকের মৌখিক সমর্থন থাকলেও এটার সুষ্ঠু বিকাশ ও উন্নতির জন্য যাদের সহযোগিতা ও সমর্থন একান্ত অপরিহার্য বর্তমানে তাদের কারো এসবের ভাবনা আছে কিনা সন্দেহ। এমন এক সময় এ প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, যখন বনজঙ্গল সংরক্ষণ তথা পরিবেশ রক্ষা করা বিশ্বব্যাপী অতি প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক ও সুশীল সমাজ পরিবেশ ভারসাম্যের অবনতির কারণেই অদূর ভবিষ্যতে ভয়াবহ পরিণতির ইঙ্গিত দিয়ে যাচ্ছেন। তাদের মতে অবাধে বৃক্ষ কর্তন, বন জঙ্গল উজাড় এবং আবহাওয়ায় বিষাক্ত ধোঁয়ার উদগীরণ ইত্যাদির কারণে "ওজোন স্তর" এর ক্ষতিসাধিত হতে চলছে। ফলে মেরু অঞ্চলে যদি বরফ গলতে শুরু করে তবে বাংলাদেশের মত বদ্বীপগুলোর বেশ কিছু অংশ অদূর ভবিষ্যতে সমুদ্রে তলিয়ে যেতে পারে। এ অবস্থায় অভয়ারণ্যের বিরোধিতা করা, বনজঙ্গল কেটে সঙ্কুচিত করা নিঃসন্দেহে সচেতন জনগণের জন্য উদ্বেগের কারণ। বস্তুতপক্ষে, এ কারণেই পশুপক্ষী এবং বন সংরক্ষণের জন্য জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের তৎপরতা জোরদার হচ্ছে।

এ অবস্থায় অভয়ারণ্য অধ্যুষিত এলাকার পার্শ্ববর্তী স্থানে বসবাসকারী জনগণকে অভয়ারণ্যটির জন্য উৎসাহিত করতে হলে, এটার সুফল সম্বন্ধে ব্যাপক প্রচারণার প্রয়োজন আছে। এটার জনহিতকর দিকটা জনগণ উপলব্ধি করতে পারলে এটার বিরোধিতা থেকে তারা বিরত থাকবে। এ উদ্দেশ্যে যদি কর্তৃপক্ষের নিকট এমন কিছু প্রস্তাব রাখা যায়, যার দ্বারা অভয়ারণ্যটাকে আরও সমৃদ্ধ করা যায় এবং পার্শ্ববর্তী জনগণও উপকৃত হয়, তা হবে দূরদর্শিতাপূর্ণ যুগোপযোগী একটি পদক্ষেপ। এ লক্ষ্যে, নাম মাত্র অভয়ারণ্য না করে দৈন্যদশা হতে এটাকে উত্তরণের জন্য অনতিবিলম্বে নিচের কিছু প্রস্তাব কর্তৃপক্ষ বিবেচনায় নিতে পারেন ঃ

(ক) বর্তমানে সরজমিনে ১৯ হাজার একরের চেয়ে অনেক কম জমি আছে এ অভয়ারণ্যে। যেটুকু জায়গা আওতাভুক্ত আছে তাতে অন্যসব প্রকার বন্য প্রাণীর জন্য অভয়ারণ্যটি সুবিধাজনক হলেও হাতির জন্য মোটেই আদর্শ স্থান নয়। কেননা এটার অভ্যন্তরে খাল-বিল, জলধারা, নদ-নদী ইত্যাদি কমে

আসছে। তদুপরি খাদ্যাভাবে দিবালোকেও হাতি জন বসতিতে চলে আসে এবং জনগণের ধানী জমির ফসল বিনষ্ট করে। ফলে এর আশেপাশে শত শত একর জমি পতিত অবস্থায় পড়ে আছে। এ অবস্থায় হাতি এখান থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার জন্য জরুরি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।

(খ) চট্টগ্রামের আলি কদমে এবং অন্যান্য স্থানে হাতির জন্য কয়েকটি অভয়ারণ্য আছে। হাতির উপযুক্ত বাসস্থান হওয়া সত্ত্বেও সেখানে পর্যাপ্ত সংখ্যক হাতি নেই। পাবর্ত্য চট্টগ্রামে আরও বহু জায়গা আছে যেখানে হাতির বাসস্থানের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ বিদ্যমান আছে। ট্রানকুলাইজার গান ব্যবহার করে বা অন্য কোন উপায়ে হাতির পাল এখান থেকে উপযুক্ত জায়গায় যদি সরানো যায়, তখন সংরক্ষিত এলাকাটি যে কোন প্রকার বন্য প্রাণীর জন্য আদর্শ অভয়ারণ্যের স্থান হবে। এ জন্য "বিশ্ব বন্য প্রাণী সংরক্ষণ সংস্থা" হতে যে কোন সময়ে সহযোগিতা পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

(গ) চারিদিক থেকে প্রোটেক্টেড (ঘেরাও দিয়ে এবং পাহারাদার রেখে) করে জায়গাটি যদি ইকোপার্ক বা সাফারি পার্ক এ রূপান্তরিত করা যায় তবে স্থানটির যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। এর মধ্যে সব প্রকার হরিণের ব্রিডিং সেন্টার করা যেতে পারে, এবং টেংগারু, ভালুক, বানর, হনুমান এবং বিলুপ্তির পথে অন্যান্য বন্য প্রাণীগুলো সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত স্থান হিসেবে গড়ে তোলা যাবে। এর অভ্যন্তরে লেক তৈরি করে পাখির জন্য অভয়ারণ্য করা হলে এটাকে আও নয়নাভিরাম করে তুলবে। তখন এটা পর্যটকদের জন্যও আকর্ষণীয় স্থান হবে বলে আশা করা যায়।

(ঘ) এর মধ্যবর্তী স্থানে রাস্তা তৈয়ার করে অনেকগুলো পিকনিকস্থল গড়ে তোলা যায়। বনায়ন আরও সমৃদ্ধ করে গাছ রক্ষা করলে বন্য প্রাণীর সাথে সাথে বহু টাকার গাছও এতে উৎপন্ন হবে। এ কার্যক্রমের জন্য পার্শ্ববর্তী এলাকার বহু লোকজনের চাকরি এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও নিশ্চিত হবে।

(ঙ) এটা পরিচালনার জন্য কোন বেসরকারি সংস্থা বা এন জি ও কে ২০ থেকে ২৫ বছরের জন্য লিজ দেয়া হলে বন্য প্রাণী সংরক্ষণের সাথে সাথে সরকারেরও এ খাত থেকে একটি বিরাট অঙ্কের আয় হবে। এভাবে বিনা দ্বিধায় এটাকে যুগোপযোগী একটি দর্শনীয় স্থান হিসেবে গড়ে তোলা যাবে।

সর্বোপরি এই কার্যক্রম গ্রহণ করা হলে এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের নিকট অভয়ারণ্য স্থাপনের জন্য কোনপ্রকার বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে না, কেননা এতে লোকজন নিয়োগ করা হলে পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকরাই উপকৃত হবে। চতুষ্পার্শ্বে ভালভাবে বেড়া দেওয়া হলে তাদের ধানক্ষেতও বন্যপ্রাণী হতে রক্ষা পাবে।

(খ) পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃত ও বনজঙ্গলের পরিস্থিতি ঃ বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্ব কোনায় আনুমানিক ৫,০৯৩ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে অবস্থিত পার্বত্য চট্টগ্রাম।

ছোট বড়, ঘন সবুজ পাহাড়, অসংখ্য তরুলতা ও বৃক্ষকুঞ্জ, নদনদী, লাল মৃত্তিকা, মানব সৃষ্ট হ্রদ ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ এ পার্বত্যাঞ্চলটির মনোমুগ্ধকর নৈসর্গিক দৃষ্টিনন্দন সৌন্দর্যের প্রকৃত রূপ ভাষায় পকাশ করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। বাংলাদেশের এক-দশমাংশ এ অপরূপ অনিন্দ সুন্দর পার্বত্যাঞ্চলের নয়নাভিরাম শোভা যে কোন প্রাকৃতিক দৃশ্য অবলোকনকারী সৌন্দর্যের পূজারীকে নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট করার জন্য যথেষ্ট। পাহাড় এবং জঙ্গলের রহস্যে রোমাঞ্চের কোন শেষ নেই, এগুলোর প্রতি আকর্ষণও বিশ্বজনীন। এর ছোঁয়া নিবিড়ভাবে অনুভূত হয় অফুরন্ত সৌন্দর্যের লীলাভূমি পার্বত্য চট্টগ্রামে। উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত ছোট বড় পর্বত রাশিসমৃদ্ধ চিরহরিৎ এ বনভূমির নিখুঁত বর্ণনা দেয়ার প্রয়াস অহেতুক বাড়াবাড়ি ছাড়া কিছু নয়। এখানকার সবুজ পর্বতরাশির মধ্যে বনানীর মোহনীয় মন উদাস করা নয়নলোভন রূপ এমনভাবে ভ্রমণকারীদের আপ্লুত ও বিমোহিত করে যে, প্রথমবার দেখার পর পুনরায় এ দৃশ্য অবলোকনের জন্য বহু লোক এক দুর্নিবার আকর্ষণে ব্যাকুল হয়ে থাকে। একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, পরিকল্পিতভাবে পর্যটকের আদর্শ স্থান হিসেবে গড়ে তোলা হলে বিশ্বের যে কোন পর্যটনের স্থানের সাথে এটার তুলনা করা যেত।

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড় পর্বত, বন জঙ্গল ইত্যাদির পরিস্থিতির বর্ণনার পূর্বে এলাকাটি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা দেয়া প্রয়োজন। জেলাটির পূর্বদিক জুড়ে ভারতের মিজোরামের লুসাই পাহাড়পুঞ্জ ও মায়ানমার, দক্ষিণে মায়ানমার, পশ্চিমে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা এবং উত্তর ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য। এ পার্বত্য অঞ্চলটির ১০০ ফুট থেকে ৩০০০ ফুট পর্যন্ত উঁচু পাহাড়পুঞ্জ উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত। এটার সর্ব উঁচু পাহাড় কেওকারাডং ২৯৬০ ফুট উচ্চে অবস্থিত এবং বাংলাদেশের সর্ব উঁচু পাহাড় বলে যার নামডাক আছে। এলাকাটির ৭টি প্রধান নদী হলো ঃ চেংগি, মায়ালি, কাসালং, কর্ণফুলি, রাইনখিয়াং, সাংগু ও মাতামুহুরি। ১৯৬০ সালে ১৮০০ ফুট দৈর্ঘ্য এবং ১৫৬ ফুট উঁচু কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ বসানো হয়, যার ফলে ২৬৫ বর্গমাইলের কৃত্রিম হ্রদ সৃষ্টি হয় পুরানো রাংগামাটি শহরে। রাইন খিয়ান কাইন ও যোগকাইন নামে আরও ২টি কৃত্রিম হ্রদ তৈরি করা হয়েছে এ অঞ্চলে।

পার্বত্য চট্টগ্রামকে ১৯৮৪ সালে তিনটি জেলায় ভাগ করা হয়। এগুলো হলো উত্তরে খাগড়াছড়ি, মাঝখানে রাংগামাটি এবং দক্ষিণে বান্দরবান। পুরা এলাকা ২৭টি উপজেলায় বিভক্ত; এর মধ্যে খাগড়াছড়িতে ৮টি (খাগড়াছড়ি, পানছড়ি, দীঘিনালা, মাটিরাংগা, রামগড়, মানিকছড়ি, মহলছড়ি ও লক্ষ্মীছড়ি), রাংগামাটিতে ১০টি (রাংগামাটি, বাঘাইছড়ি, লংগুদু, বরকল, নানিয়ারছড়া, কাউখালি, জরাইছড়ি, কাপ্তাই, রাজস্থলি ও বিলাইছড়ি) এবং বান্দরবানে ৭টি (বান্দরবান, রোয়াংছড়ি, রুমা, লামা, থানচি, আলিকদম ও নাইক্ষংছড়ি)। এক জরিপ অনুযায়ী

পার্বত্য চট্টগ্রামের লোকসংখ্যা ৯ লক্ষ ৭৪ হাজার, যার মধ্যে ৬ লক্ষ ৬৩ হাজার উপজাতীয় এবং ৩ লক্ষ ১১ হাজার বাঙালি। জনসংখ্যার শতকরা ৩৯.৩৮ ভাগ বাঙালি, ৩০.৫৭ ভাগ চাকমা, ১৬.৬০ ভাগ মারমা, ৭.৩৯ ভাগ ত্রিপুরা, ২.১৭ ভাগ মুরং, ২.০৪ ভাগ তংচংগ্যা, বাকি অন্যান্য উপজাতি।

এদের প্রধান ১৩টি উপজাতি হলো ঃ চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, মুরং, তংচংগ্যা, বৌমং, পাংখু, খুসি, উক্সাই, খিয়াং, ছক, লুসাই ও রিয়ং। কথিত আছে আরকানি চাকমাদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে প্রথমে আদি অধিবাসীগণ এ অঞ্চলে বসতিস্থাপন করেছিল। পরবর্তীকালে ব্রহ্মযুদ্ধের সময় মগরা যখন চাকমাদের বিতাড়িত করে, চাকমারা তখন পার্বত্য চট্টগ্রামকে বসতির জন্য উপযুক্ত স্থান মনে করে এখানে ঢুকে পড়ে। চাকমা, মোরং এবং বৌম'দের রাজাই তাদের প্রধান সমাজপতি। প্রত্যেক রাজার নিজস্ব ভূসম্পত্তি আছে। সমাজ শাসন ও কর আদায় তাদের প্রধান দায়িত্ব। প্রতিটি মৌজায় একজন হেডম্যান আছে এবং গ্রামে আছে কারবারি। হেডম্যান ও কারবারির অনুমতি নিয়ে বিশেষ পাহাড়ে বা জায়গায় যে কেউ থাকতে পারে কিন্তু তারা ভূমির মালিক হতে পারে না।

এ অঞ্চলে এমনও স্থান আছে যেখানে একটি পাহাড়ের এক পাশ থেকে অন্য পাশের দূরত্ব ১০০ ফুট। তবে হাঁটা পথে এ দূরত্ব অতিক্রম করতে হলে ১০০০ ফুট পার হতে হয়। যাতায়াত ব্যবস্থা ছিল বহুকাল ধরে এখানে অবহেলিত। অভ্যন্তরীণ যাতায়াতের জন্য ব্রিটিশ সরকার হাতি চলাচলের রাস্তা তৈয়ার করেছিল। তবে পাকিস্তান সরকারের আমল হতে এ অঞ্চলে যাতায়াতের উপর বেশ গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল। বাংলাদেশ সরকার শুরু থেকেই এ অঞ্চলের বহুবিধ সামাজিক ও আঞ্চলিক সমস্যা নিরসনের জন্য তৎপর। যাতায়াতের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রথম থেকেই গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এখানে সেনাবাহিনীর সদস্যরা দুর্গম পাহাড় কেটে কালভাট নির্মাণ করে ইতোমধ্যে ১৪টি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক নির্মাণ করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমির পরিমাণের এক তথ্য হ'তে (আহা পর্বতঃঅতন্দ্রজনতা) জানা যায় যে এর ৩২.৫৯ লক্ষ একর জমির মধ্যে প্রায় ২৯.০২ লক্ষ একর জমি পাহাড় পর্বত আচ্ছাদিত। অন্য একটি পরিসংখ্যানে বর্ণিত আছে (উক্ত বইয়ের ২২২ পৃষ্ঠায়) উত্তর বন বিভাগে ৬১৭ বর্গমাইল, দক্ষিণ বন বিভাগে ৩১৫ বর্গমাইল, শংখ বনবিভাগে ১২৮.২৫ বর্গমাইল এবং মাতামহুরি বনবিভাগে ১৬০.৭১ বর্গমাইল বনাঞ্চল সংরক্ষিত আছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়-পর্বতের সমস্যার মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলো ভূমি বেদখল হওয়া। তাছাড়া বসতি স্থাপনের জন্য পাহাড়-পর্বত বিনষ্ট করা, গাছ কেটে জঙ্গল কেটে এবং তাতে জুম চাষের জন্য আগুন ধরিয়ে দেয়া ইত্যাদি কার্যক্রম দ্বারা এলাকাটি ক্রমাগত তার বৈচিত্র্য হারাচ্ছে। প্রকৃতির এ রুদ্ররোষ এবং জনগণের অবিবেচক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধকল্পে প্রশাসন এবং বিবেকবান

জনগোষ্ঠী সর্বদাই সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করে আসছে। তবে এলাকার নানাবিধ সামাজিক, রাজনৈতিক তথা সামগ্রিক সমস্যাসমূহের প্রভাব বিবেচনায় না নিয়ে শুধু পাহাড়-পর্বত ও জীব-জন্তুর অস্তিত্বের ব্যাপারে কোনপ্রকার নির্দেশনা কার্যকরী হচ্ছে না এসব অঞ্চলে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশাল এলাকা জুড়ে কিছু কিছু স্বার্থান্বেষী লোভী দেশপ্রেমহীন মানুষনামধারী অমানুষ পাহাড় জঙ্গল ও এলাকার জীব বৈচিত্র্য ধ্বংসের কাজে তৎপর আছে, যাদের কারণে এলাকার বনাঞ্চল মারাত্মক হুমকির মুখে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বনজ ও প্রাণিজ সম্পদ ধ্বংসের কর্মকাণ্ডে কতিপয় লোক লিপ্ত আছে বলে পত্র-পত্রিকার খবর হ'তে প্রতীয়মান হয়। এখানে এক দিকে চোরা শিকারিদের অপরিণামদর্শী কর্মকাণ্ডের ফলে দুর্লভ প্রজাতির বন্য প্রাণীসহ বন্য প্রাণিকুলের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন, অপরদিকে পাহাড়ি সম্পদ আহরণ ও কাঠ পাচারকারীদের দ্বারা বিলুপ্ত হচ্ছে মূল্যবান বনজ সম্পদ ও দুর্লভ লতাগুল্ম। বন-জঙ্গল উজাড় হওয়ার পাশাপাশি বন্যপ্রাণীও বিলুপ্ত হচ্ছে ক্রমাগত প্রতিকারহীন বিনাশ প্রক্রিয়ার যূপকাষ্ঠে বলিদান হচ্ছে বহু দুর্লভ প্রাণী। পার্বত্য চট্টগ্রামে অরণ্যের অহঙ্কার ভয়ঙ্কর সুন্দর বাঘ, হাতি, নানা প্রকার হরিণ ও অন্যান্য দুর্লভ প্রাণী পৌঁছে বিলুপ্তির প্রান্ত সীমায়। এর পিছনে একটি বিশাল নিধনযজ্ঞও তৎপর। বন উজাড় হওয়ার কারণে বন্যপ্রাণীর অস্তিত্ব বিপন্ন হচ্ছে, বহু বিরল বৃক্ষ জীব-জন্তুর বিলুপ্তি ঘটছে বন উজাড় হওয়ার কারণে, মানুষের অবিমৃশ্যকারিতা চিরতরে নিঃশেষ করছে অসংখ্য ফল-ফুল-লতাগুল্ম ও পাখ-পাখালি।

এ হেন পরিস্থিতি মোকাবেলা করা বন বিভাগের জন্যও সম্ভবপর নয়। তাদের কর্মকর্তাদের সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যা, সীমাবদ্ধতা ও প্রতিকূলতার কারণে তারা যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারছে না। তাদের আধুনিক অস্ত্র সুসজ্জিত দক্ষ জন শক্তিরও প্রকট অভাব। দুর্ধর্ষ কাঠ চোরা কারবারী ও সংঘবদ্ধ চোরাগোপ্তা শিকারিদের সাথে এ অবস্থার মোকাবিলা করা এক দুঃসাধ্য ও দুরূহ ব্যাপার। তবে সর্বস্তরের জনগণকে সচেতন ও দায়িত্ববান করা হ'লে এ ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

এ প্রেক্ষিতে সম্প্রতি একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরের কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হ'ল ঃ

দৈনিক যুগান্তর, ৬ই এপ্রিল ২০০৪ ঃ "বান্দরবানে অবাধে বনসম্পদ উজাড় ও জুমের আগুনে লোকালয়ে ছুটছে বন্যপ্রাণী"ঃ পাহাড়ি জনপদে ব্যাপকহারে গভীর জঙ্গলের বৃক্ষরাজি উজাড় হচ্ছে। সেই সঙ্গে পরিবেশ বিধ্বংসী সর্বনাশী জুম চাষের জন্য পাহাড়ে আগুন লাগানোয় তীব্র খাদ্য সংকটে পড়ে বন্যপ্রাণিকুল দিশেহারা হয়ে পড়েছে। বান্দরবান পার্বত্য জেলায় গভীর জঙ্গল বেষ্টিত এলাকায় রয়েছে দেশের বিলুপ্তপ্রায় বিরল প্রাজতির প্রাণিকুল। বিরল প্রাণিকুল ধাপে ধাপে

ছুটে আসছে লোকালয়ে। জেলায় ইতোমধ্যেই ধরা পড়েছে চার প্রজাতির বিলুপ্তপ্রায় বিরল প্রাণী।

বান্দরবান জেলার দুর্গম পাহাড়ি এলাকা থেকে জেলা সদর এবং রোয়াংছড়ি উপজেলা সদরের অদূরে ধেয়ে আসা চার প্রজাতির বিলুপ্তপ্রায় বিরল প্রাণী পাহাড়ি চাষীদের হাতে ধরা পড়েছে। এসব বিরল প্রাণীর মধ্যে রয়েছে একটি বাচ্চা বন-মানুষ, লজ্জাবতি বানরের বাচ্চা, একজোড়া জংলি ময়ূর এবং একজোড়া গন্ধগোকুল বা লম্বালেজি বড় জাতের বেজি। অনুসন্ধান করে জানা গেছে, বন-মানুষের বাচ্চাটি ধরা পড়ে জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলার বেংছড়ি এলাকায় গত মার্চ মাসে। অপর তিন প্রজাতির বিরল প্রাণী ধরা পড়ে গত তিন মাসে। সেগুলো ধরা পড়ে বান্দরবান সদর উপজেলার গভীর জঙ্গল শৈলপ্রপাত এলাকায় এবং রোয়াংছড়ি উপজেলার দুর্গম গ্রাম থেকে। এ ছাড়াও প্রতি বছর জুম চাষের প্রাক্কালে (মার্চ-এপ্রিল-মে) জেলার রোয়াংচড়ি, বুমা, থানচি, আলীকদম, নাইক্ষ্যংছড়ি এবং বান্দরবান সদর উপজেলার দুর্গম ও গহিন অরণ্য থেকে বিভিন্ন প্রজাতির বিলুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণী পাওয়া যাচ্ছে। তবে সেসব একশ্রেণীর উপজাতিরা খেয়ে ফেলে। ফলে ধরা পড়া বিরল প্রজাতির বন্যজন্তু সহজেই সচেতন নাগরিকদের নজরে আসে না। যার ফলে এদের রক্ষা করা যায় না"।

"দেশের তিনটি সর্বোচ্চ পর্বতমালার অবস্থান এই জেলায়। অপরদিকে মিয়ানমার এবং ভারতের তিনটি রাজ্যের অবস্থানও বান্দরবান জেলার সীমানা ঘেঁষে। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়াও ওই দু প্রতিবেশী দেশের গভীর অরণ্য থেকেও অবাধে বন্যপ্রাণিকুলের আসা-যাওয়া রয়েছে এ বান্দরবান জেলায়। বান্দরবান জেলা প্রশাসনের নেজারত ডেপুটি কালেক্টর (এনডিসি) কাজী আবেদ হোসেন জানিয়েছেন, উপজাতীয় জুম চাষীদের হাতে ধরা পড়া তিন প্রজাতির বিরল প্রাণী উদ্ধার করে ইতোমধ্যেই মেঘলা পর্যটন কেন্দ্রের চিড়িয়াখানায় জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে সংরক্ষণকরা হয়েছে। প্রাণীগুলো খাবার খাচ্ছে এবং সবল ও সুস্থ রয়েছে বলে জেলা প্রশাসক জানিয়েছেন। বন্যপ্রাণী গবেষকদের মতে, পার্বত্য বান্দরবান জেলার অরক্ষিত বিশাল পাহাড়ি এলাকায় এখনও দেশের বিলুপ্তপ্রায় বিরল প্রাজতির অসংখ্য বন্যপ্রাণী রয়েছে। সময়ে সময়ে সেগুলো লোকালয়ে ছুটে আসছে খাদ্যের সন্ধানে এবং খুঁজছে নিরাপত্তাও। পার্বত্য এলাকায় অবাধে বনসম্পদ উজাড়ের কারণে তীব্র খাদ্যাভাব বিরাজ করছে, তাই জঙ্গল থেকে ছুটে আসছে জনবসতি এলাকাসমূহে।"

এর দুদিন পর ৮-৪-২০০৪ তারিখে পত্রিকাটির সম্পাদকীয় কলামে "জুম চাষ" শিরোনামে প্রাকশিত তথ্যের কিছু অংশ এখানে বর্ণিত হ'ল।

জুম চাষ ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম চাষের সময় আসিয়া গিয়াছে। পাহাড় পোড়াইয়া জুমের জমি প্রস্তুত করিবার ফলে গাছগাছালি, বন্যপ্রাণী ও পরিবেশের

বড় ক্ষতি হইয়া থাকে। ক্ষতি যে একেবারে পূরণ হয় না তাহা নহে। প্রকৃতি কিছু ক্ষতিপূরণ করিয়াই দেয়। কিন্তু ক্ষতিপূরণের গতিটি মন্থর। সেই জন্য জুম চাষ লইয়া সকল সময়ই আপত্তি ওঠে। পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়। আমাদের বান্দরবান প্রতিনিধি এ বিষয়ে একটি নতুন খবর দিয়াছেন। দুর্গম এলাকাগুলিতে জুম চাষের কারণে বনে আশ্রয়চ্যুত হইয়া বন্যপ্রাণী নামিয়া আসিতেছে লোকালয়ে। কয়েকটি বিরল প্রজাতির প্রাণী ধরা পড়িয়াছে, রহিয়াছে জেলা প্রশাসকের হেফাজতে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা পাহাড় পোড়াইয়া গর্ত করিয়া একই সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের ফসল ফলাইবার রীতি অনুসরণ করিতেছে দীর্ঘদিন ধরিয়া। কোন বৎসর খাদ্যাভাব দেখা দিলে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর মধ্যে পরবর্তী বৎসরে জুম চাষে উৎসাহ আরও বাড়িয়া যায়। জুম চাষ লইয়া বিতর্ক চলিতেছে অনেক দিন ধরিয়া। ক্রমবর্ধমান জুম চাষে পরিবেশবাদীরাও উদ্বেগ জানাইতেছেন। পাহাড়ের সৌন্দর্য ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হইতেছে।

"পাহাড়িয়ারা জুম চাষ আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছে শুধু ঐতিহ্যগত কারণে নহে, তাহাদের হাতে সমতল ভূমিরও খুবই অভাব। তাহাদের অনেক জমিজমাও হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। জীবন হইয়া উঠিয়াছে অশান্ত ও অনিশ্চিত। চাকরি গ্রহণ করিবার বা অন্যান্য কাজে নিয়োজিত হইয়া জীবিকা নির্বাহ করিবার সুযোগ তাহাদের বড় একটা নাই। এই অবস্থায় প্রয়োজন তাহাদের সনাতনী কষ্টকর জীবনধারা হইতে বাহির হইবার সুযোগ সৃষ্টি করা। আমরা তাহা করিতে পারি নাই। জুম চাষের বাহিরে পার্বত্য চট্টগ্রামে আর কী কী করা যাইত, কোন্ কোন্ উপায়ে তাহাদের আরও একটু ভাল থাকিবার ব্যবস্থা করা যাইত, তাহা লইয়া ভাবনা-চিন্তা হইয়াছে কমই। যুদ্ধাবস্থা ও অশান্ত পরিস্থিতির কারণে বিকল্প লইয়া ভাবনা-চিন্তার সুযোগও পাওয়া যায় নাই। পার্বত্য চট্টগ্রামের দরিদ্র আদিবাসীদের জন্য এনজিও কর্মকাণ্ডও বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। তাহারই মধ্যে আসিয়াছে জুম চাষে পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইবার খবর। পরিবেশের এই ধরনের ক্ষতির মধ্যে পিছাইয়া পড়া একটি জনগোষ্ঠীর জীবনের দাবি কিছুটা হইলেও মিটিতেছে বলিয়া বিষয়টির নিষ্পত্তি সহজ নহে। কিন্তু ধীরে ধীরে জুম চাষ হইতে তাহাদের বাহির করিয়া আনিতে হইবে। ইহার কোন বিকল্প নাই। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী নেতারাও নিশ্চয়ই এই বিষয়ে ক্রমে তাহাদের সচেতনতার পরিচয় দিবেন বলিয়া আমরা মনে করি"।

পরের দিন পত্রিকায় জনাব এস সাকলাইন উপ-পরিচালক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, কয়েকটি মূল্যবান কথা লিখেছেন যার কিছু অংশ নিম্নরূপ ঃ

"বাংলাদেশের মতো একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের ভেতরে কোন একটি অঞ্চলে সার্বক্ষণিক অস্থিরতা বিরাজ করলে তা দেশের সার্বিক উন্নয়নকে ব্যাহত করে। তাতে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় দেশে-বিদেশে। পার্বত্য রাজনীতি ও প্রশাসনে যে

ধস নামে তাতে জাতীয় জীবনকেও নাড়া দেয়। এসব কারণে বিষয়টি যে খুবই সংবেদনশীল এটা সরকার ও জনগণকে সমানভাবে বুঝতে হবে। জনগণের অধিকারের সঙ্গে দায়িত্বের বিষয়টি জড়িত। যে হারে একজন নাগরিক অধিকার ভোগ করবেন, ঠিক সে হারে তিনি যদি দায়িত্ব পালন না করেন তা হ'লে সর্বত্র একটি অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। এদিক থেকে পার্বত্য অঞ্চলের সকল নাগরিকের দায়িত্ববোধ প্রখর হওয়া বাঞ্ছনীয়....। এখন চিন্তা করতে হবে সম্পাদিত পার্বত্য চুক্তির মধ্যে থেকে পার্বত্য এলাকায় বসবাসকারী নৃতাত্ত্বিক জাতি গোষ্ঠী নির্বিশেষে সব সম্প্রদায়ের অধিকার সংরক্ষণ ও শান্তি কি ভাবে বজায় রাখা যায়।"

"আমরা যদি মনে রাখি, পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী বাংলা ভাষী ও অবাংলা ভাষী সবাই বাংলাদেশী, তাহলে সেখানকার সমস্যা সমাধান করা সহজ হবে। আর যদি সবাই নিজ স্বার্থ রক্ষায় অনড় থাকি তাহলে কোনদিনও সেখানে শান্তি ফিরে আসবে না এবং কারও অধিকারও সুপ্রতিষ্ঠিত হবে না।"

ইদানীং বিভিন্ন সংবাদপত্রে বিশেষ করে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চলে হাতি কর্তৃক মানুষ হত্যা, ঘরবাড়ি ও জমির ধান বিনষ্ট করার সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। প্রসঙ্গত একটি প্রশ্নের অবতারণা হয় সে হাতি কি মানুষের স্থানে এসেছে না মানুষ হাতির জায়গা দখল করেছে? যদি হাতির বাসস্থান মানবজাতি দ্বারা দখল হয়ে যায়, তবে হাতিকে দোষারোপ করার পূর্বে ওগুলোর বাসস্থান ও আহারের সুযোগ সুবিধা অক্ষুণ্ন রাখার কথা পুনঃবিবেচনা করা উচিত। ওগুলোর নিবাস/আহারের স্থানে আর যেন উৎপাত না হয় এ লক্ষ্যে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া এবং সম্ভাব্য স্থানে ওগুলোর অভয়ারণ্য প্রস্তুত করার এখনি সময়।

ইদানীং এ অঞ্চলে জনবসতি দ্রুত প্রসারের প্রেক্ষিতে বিপন্ন জঙ্গল এবং জীবজন্তু সংরক্ষণের লক্ষ্যে কিছু বাস্তবমুখি সুপারিশ বিবেচনায় রাখার দাবি রাখে। অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিম্নের কয়েকটি যুগপোযোগী কার্যক্রম জরুরি ভিত্তিতে বিবেচনা করা যেতে পারে।

সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে কয়েকটি (অন্তত ৮ থেকে ১০টি) পশুপক্ষীর অভয়ারণ্য স্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। বিশেষ করে জনবসতির থেকে বহু দূরে হাতির জন্য কয়েকটি অভয়ারণ্য নির্ধারণ করা যেতে পারে। অভয়ারণ্য অথবা ইকুপার্ক- গুলোকে প্রাইভেট মালিকানাধীনে হস্তান্তর করা হলে এবং নির্ধারিত অরণ্য ২০ থেকে ৩০ বছরের জন্য লিজ দেয়া হলে, অভয়ারণ্য/ইকুপার্ক পরিচালনাকারীরা জমি ব্যবহার করেও আর্থিকভাবে উপকৃত হতে পারবে।

আমাদের দেশে পর্যটন ও পর্যটক এর ব্যাপারে জনমনে এক ভ্রান্ত ধারণা আছে। তা হলো নাইট ক্লাব ক্যাসিনো বা এ জাতীয় রাত্রি কালীন আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থাবিহীন কোন দেশে পর্যটকরা আকৃষ্ট হয় না। অপর দিকে

বিষয়সমূহ আমাদের দেশের সংস্কৃতি, ধর্মীয় চেতনা, অনুভূতি এবং ঐতিহ্যের সাথে সাংঘর্ষিক। বস্তুতপক্ষে প্রমোদের ব্যবস্থার বিষয়টি সত্য নয়। কারণ পর্যটন শিল্প অনেক প্রকারের আছে, যার মধ্যে অনেকগুলো উল্লিখিত বিষয়সমূহের সাথে সংঘাতপূর্ণ নয়। যেমন ইকো-টুরিজম। ইকোটুরিজম একটি সম্ভাবনাপূর্ণ পর্যটন শিল্প যা প্রাকৃতিক প্রাচীন নিদর্শন, ঐতিহ্য এবং হেরিটেজ ইত্যাদির সমন্বয়ে গঠিত হয় এবং ওগুলো প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য রক্ষণাবেক্ষণে যত্নবান হয়। ইকো-টুরিজমের উন্নয়নের মাধ্যমে দেশীয় প্রাচীন সভ্যতা, ঐতিহাসিক স্থান, সংস্কৃতি, কৃষি এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ ইত্যাদি বিনষ্ট হওয়ার-বা এগুলোতে বিরূপ প্রভাব পড়ার কোন অবকাশ থাকে না। বরঞ্চ এগুলোর সংরক্ষণের মাধ্যমে ইকো-টুরিজমের উন্নয়ন করা হয়। যে গুলোতে পর্যটক দারুণভাবে আকৃষ্ট হয়।

উল্লেখ্য যে, বিশ্ব পর্যটন সংস্থার এক হিসাব অনুযায়ী ২০০৩ সালে প্রায় ৭০০ মিলিয়ন (বা ৭০ কোটি) এর মত পর্যটক বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেছেন যার শতকরা ৫০ ভাগ ছিল ইকো-টুরিস্ট। বর্তমানে বার্ষিক শতকরা ৫ ভাগ হারে ইকো-টুরিজম বৃদ্ধি পাচ্ছে। উক্ত বছরের ৭ মাসে মালেশিয়া ইকো-টুরিজম হতে প্রায় ৮.৩ বিলিয়ন ডলার আয় করেছে। ইন্দোনেশিয়াও এ খাত হতে বছরে প্রায় ৫০০ মিলিয়ন ডলার আয় করে। (ডেইলী স্টার ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৪)।

বাংলাদেশের ইকো-টুরিজম উন্নয়নের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি সম্ভাবনাময় স্থান। এছাড়াও দেশে বহু প্রাকৃতিক নিদর্শন আছে যেগুলোতে পর্যটক নিঃসন্দেহে আকৃষ্ট হবে, যেমন–সুন্দর বন (ইউনেসকো কর্তৃক স্বীকৃত বিশ্বের সর্ব বৃহৎ ম্যানগ্রোভ), মহাস্থানগড় (বগুড়া), কান্তজী মন্দির (দিনাজপুর), ময়নামতি (কুমিল্লা), ষাটগোম্বুজ মসজিদ (বাগের হাট) ইত্যাদি।এছাড়াও বহু মন্দির, পেগোডা, দুর্গ এবং মোগল আমলের বহু মসজিদ, কিল্লা ও প্রাচীন নিদর্শনসমূহকে ইকো-টুরিজমের জন্য নির্ধারণ করা যায়। এর সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের বন ভূমির জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণের মাধ্যমে যদি ইকো-টুরিজমের স্থান হিসেবে রূপ দেয়া যায় তবে নিঃসন্দেহে এ খাত বৈদেশিক মুদ্রা আয়-এর ব্যাপারে প্রাধান্য পাবে। এতে বৈদেশিক মুদ্রা আয় ব্যতীত বহু লোকের কর্মসংস্থানও হবে।

বর্তমানে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের জঙ্গল ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের লক্ষ্যে নতুন করে চিন্তাভাবনা করার সময় এসেছে। এ ক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে বিশ্বের নামি-দামি অভয়ারণ্য এবং পার্ক যেসব জায়গায় অবস্থিত এবং সে সব স্থানে যে প্রাকৃতিক পরিবেশ বিদ্যমান পার্বত্য চট্টগ্রামেও অনুরূপ কিংবা ওগুলোর চেয়ে উন্নত প্রাকৃতিক পরিবেশ আছে। তাই পর্যটক আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে বিশ্বের অন্যান্য জায়গার ন্যায় এখানে পার্ক/অভয়ারণ্য, ইকোটুরিজম স্থাপন করার চিন্তা-ভাবনা করার সময় এসেছে।

চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত সমগ্র বাংলাদেশের বন/জঙ্গল, বিভিন্ন তথ্য অনুযায়ী, খুবই দ্রুত উজাড় হয়ে সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সবার সমন্বিত উদ্যোগ ব্যতীত এগুলো রক্ষা করা সম্ভব নয়। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ, যেমন–স্বাস্থ্য, শিক্ষা, দারিদ্র্যবিমোচন ইত্যাদি বিষয়সমূহের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য উপজেলা/থানা পর্যায়ে যেভাবে সমন্বিত তদারকি জোরদার করা হয়, অনুরূপভাবে গাছগাছালি/বনাঞ্চল তথা জীবজন্তু সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও তদ্রূপ উদ্যোগ নেয়া হলে যথেষ্ট সুফল বয়ে আনতে পারে। এতদ্ব্যতীত দেশের উপজেলাসমূহের আওতাধীন বনভূমির সংরক্ষণের দায়িত্ব উপজেলা প্রশাসন-এর হাতে ন্যস্ত হলে এবং বন বিভাগকে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মত উপজেলার একটি বিভাগে পরিণত করা হলে এর সুদূরপ্রসারী সুফল পাওয়া যাবে বলে মনে হয়। উপজেলাভিত্তিক ফরেস্ট রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব উপজেলার সমস্ত সরকারি কর্মকর্তার উপর ন্যস্ত হলে এবং গাছ বিক্রির টাকার কিছু অংশ সরকারি সংশ্লিষ্ট উপজেলা ভোগ করতে পারলে, বন জঙ্গল উজাড় হয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা যাবে বলে আশা করা যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে পরিবেশ উন্নয়নে বর্তমানে যে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, তার কিছু কিছু সুফল ইতোমধ্যেই পরিলক্ষিত হচ্ছে। সমুদ্র উপকূলে সবুজ বেষ্টনী তৈয়ার কার্যক্রমসহ বিভিন্ন পতিত জায়গায় বৃক্ষ রোপণ অভিযানে বেশ সাড়া জেগেছে। সরকার জায়গার মালিক এবং বৃক্ষরোপণ ও লালন-পালনকারীর মধ্যে মুনাফার ভাগাভাগি নিঃসন্দেহে বনায়নের ক্ষেত্রে বাস্তব একটি উদ্যোগ। এর সুদূরপ্রসারী সুফল আসবে বলে আশা করা যায়। যদি এ ধরনের একটি সমষ্টিগত উদ্যোগ পার্বত্য চট্টগ্রামের খালি জায়গায় এবং জঙ্গল ও বৃক্ষবিহীন পাহাড়ি এলাকার জন্য নেয়া হয়; যে কোন স্থানে খালি জায়গা পড়ে থাকলে, ওটার উপর মালিকানা অক্ষুণ্ন রেখে বনায়নের সরকারি নির্দেশ জারি করা হলে শুধু যে কর্মসংস্থান এর সুযোগ বাড়বে তা নয় বরং বনায়নও ত্বরান্বিত হবে।

বন্যপ্রাণী ও জঙ্গল সংরক্ষণের জন্য অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশে অনেক আগে থেকেই আইন প্রণয়ন করা আছে। বর্তমানে সেগুলোকে কঠোর থেকে কঠোরতর করা হয়েছে। এমনকি পরবর্তী সময়ে শিকার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে এসব আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে শিথিলতা এবং অনেক সময় আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জটিলতার দরুন আইন অনেক সময় কার্যকরী হয় না। বন জঙ্গলের দৈন্য দশার জন্য এরূপ পরিস্থিতিই বহুলাংশে দায়ী। জনবলের অভাব এবং নানাবিধ অপ্রতুলতার ও সীমাবদ্ধতার কারণে কর্তৃপক্ষের জঙ্গল রক্ষা করার অক্ষমতার ব্যাপারটিও বলার অপেক্ষা রাখে না। এছাড়া জনগণের মনোভাব এবং সচেতনতার অভাবও জঙ্গল ধ্বংস হওয়ার জন্য অন্যতম কারণ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সৃষ্টির আদিকাল হতে শিকার করার একটি চিরাচরিৎ প্রথা চলে আসছে। তবে শিকারের দরুন পূর্বে কখনও বন্য প্রাণীর বিলুপ্তির আশঙ্কা ছিল না। শিকার ছিল কারো পেশা আবার কারো নেশা। ক্ষেত্র বিশেষে বিরত্ব প্রকাশ ও বিনোদনের উপকরণও ছিল এ শিকার। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষিত সম্পূর্ণ ভিন্ন। মানুষের অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র এবং বুদ্ধির সম্মিলিত শক্তির নিকট পশুকুল ও প্রাণিকুল চিরতরে পরাজিত ও পরাভূত। শুধু তাই নয় মানুষ কর্তৃক নিবিড় জঙ্গলের ছায়া, সবুজ বনানী তথা এগুলোর আশ্রয়স্থলও ধ্বংসের পথে।

যে কোন ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের নিকট ক্ষতির ব্যথাটা অনুভূত হয় সব চেয়ে বেশি। এ কারণেই শিকার/জঙ্গল এবং পরিবেশ ধ্বংসের পরিপ্রেক্ষিতে সত্যিকার সৌখিন শিকারি সম্প্রদায় এবং প্রাকৃতিক পরিবেশবাদীরাই অধিক ব্যাকুল এবং দারুণভাবে মর্মাহত। জঙ্গলের সাথে যাদের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক এবং পাহাড়ি জীব-জন্তুর সাথে অজান্তে নিবিড় ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছে তারাই সর্বাগ্রে এই পরিস্থিতির অবসান চায়। তারা চায় তাদের শিকার এবং জঙ্গলের সে স্বর্ণযুগের পুনরাবৃত্তি ঘটুক। সুতরাং জঙ্গল সংরক্ষণের যে-কোন পরিকল্পনার সাথে তাদেরকে সংপৃক্ত করা হলে অধিক ফলদায়ক হবে বলে মনে হয়। বইপুস্তক এবং লাইব্রেরি না থাকলে যেরূপ বিদ্যান্বেষীরা ব্যথিত হয়, শ্রোতাবিহীন মঞ্চে গায়কের যে দুর্দশা হয়, শিকারবিহীন ও জঙ্গলবিহীন এ পরিস্থিতিতে একই পরিণতি আজ শিকারিদের। তাই জঙ্গল সংরক্ষণ তথা জীব-জন্তুর বিস্তারলাভ করার মুখ্য ভূমিকা ও প্রত্যয় শিকারিদের থেকে উদ্ভাবিত হতে পারে যেমনটি হয়েছিল চুনতি অভায়ারণ্যের ক্ষেত্রে।

পাবর্ত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত সমগ্র বাংলাদেশের জঙ্গলে জন্তু-জানোয়ারের সংরক্ষণের ব্যাপারে বাস্তবমুখি পদক্ষেপ গ্রহণ করে বন সংরক্ষণের সাথে সাথে বন্যপ্রাণীর বিস্তার লাভের সমন্বিত আন্দোলন ত্বরান্বিত করার উপযুক্ত সময় এখন। তাই এ মুহূর্তে শিকারিদের শ্লোগান হওয়া উচিতঃ "আর শিকার নয় এখন বন্য প্রাণী বাঁচাবার পালা"।

এরশাদ উল্লা খান

শৈশব কেটেছে চট্টগ্রাম জেলার দখিন সীমানার শেষ গ্রাম চুনতিতে। চল্লিশ দশকের শেষদিকে তাঁর জন্মও এ গ্রামেই। ছাত্র জীবনের সূচনা হয়েছিল এ গ্রামের মাদ্রাসায়। পাহাড় আর জঙ্গল ঘেরা মায়াবী এই গ্রামে বেড়ে উঠতে গিয়ে মনের উর্বর অঙ্গণে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে নানারকম পশু-পাখি। সেই সাথে শিকার হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর নেশা।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি এ(অনার্স) ও এম এ ডিগ্রী লাভ করার পর তিনি যুক্তরাষ্ট্রের উইলিয়ামস কলেজ হতে উন্নয়ন অর্থনীতির উপর এম এ ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের গবেষণা বিভাগের উপ-মহাব্যবস্থাপক।

এরশাদ উল্লা খান ব্যক্তি জীবনে অত্যন্ত সদালাপী ও বন্ধু-বৎসল। তাঁর স্ত্রী হামিদা বেগম একজন শিক্ষিকা। তাঁদের এক পুত্র ও দু'জন কন্যা রয়েছে।

গ্রন্থন : জয়ন্ত সরকার (জন)
গ্রাফিক্স : টিপু (ডিজাইন মিডিয়া)
০১৭১১০৮২০৯